স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িকী
১ম বর্ষ ❑ ৫ম সংখ্যা ❑ জুন - জুলাই ২০১২

সম্পাদক
ডা. পুণ্যব্রত গুণ

কার্যনির্বাহী সম্পাদক
ডা. জয়ন্ত দাস

সহযোগী সম্পাদক
ডা. পার্থপ্রতিম পাল ❑ ডা. সুমিত দাশ

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা

ডা. অভিজিৎ পাল	❑	ডা. অমিতাভ চক্রবর্তী
ডা. অনুপ সাধু	❑	ডা. আশীষ কুমার কুন্ডু
ডা. চঞ্চলা সমাজদার	❑	ডা. দেবাশিস চক্রবর্তী
ডা. শর্মিষ্ঠা দাস	❑	ডা. শর্মিষ্ঠা রায়
ডা. তাপস মণ্ডল	❑	ডা. সোহম সরকার

বিন্যাস ও অঙ্গসজ্জা ❑ স্নেহাশিস পাত্র

প্রচ্ছদ ❑ গোপাল সরকার /মনোজ দে
প্রচ্ছদচিত্র ❑ অরূপ দে ও মণিশংকর

বিনিময় ২০ টাকা

প্রকাশক
স্বাস্থ্যের বৃত্ত
ফ্ল্যাট : এফ-৩, ৫০/এ কলেজ রোড
হাওড়া-৭১১১০৩

মুদ্রক
এস এস প্রিন্ট, ৮ নরসিংহ লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

এই সংখ্যায়

সম্পাদকীয়

চিঠিপত্র ৫৩

শরীর
শ্বেতী রোগের সত্যি কথা ❑ ডা. শর্মিষ্ঠা দাস ৩
পা ফুলে ঢোল ❑ ডা. রুদ্রেন্দু ভট্টাচার্য ৬
কিশোরীদের ঋতুস্রাবকালীন ব্যথা ❑ডা. কাঞ্চন মুখার্জী ৮
সমস্যাঃ কোষ্ঠকাঠিন্য ❑ডা. পুণ্যব্রত গুণ ৯
ল্যাপ কোলে ❑ডা. সুজয় বালা ও ডা. অরিজিৎ বাগ ১০
বাচ্চার চোখের যত্ন নিন ❑ ডা. চন্দন বারি ১৩
অ্যানিমিয়া ❑ডা. মৈত্রেয়ী ভট্টাচার্য ১৬

ল্যাবরেটরি
পরীক্ষার তাৎপর্য ও তাৎপর্যের পরীক্ষা ❑ ডা. জয়ন্ত দাস ১৮
গ্লুকোজখেকো কোষের সন্ধানে পেট স্ক্যান ❑ডা. সুস্মিতা ঘোষাল ২১
প্যাথোলজি— চিকিৎসা শাস্ত্রে কাব্যে উপেক্ষিতা ❑ ডা. সর্বাণী চট্টোপাধ্যায় ও ডা. জয়ন্ত দাস ২৩

শরীর সমাজ চিকিৎসা
জন্ম থেকে ছানি নিয়ে গবেষণা— একটি প্রত্যক্ষ বিবরণী ❑ ডা. গর্গ চট্টোপাধ্যায় ২৮
বিবেকানন্দের অসুস্থতাঃ কিছু তথ্য, কিছু প্রশ্ন ❑আশীষ লাহিড়ী ৩৩

ডাক্তারের ডেস্ক ৩৮

স্মরণে
ডা. পার্থসারথি গুপ্ত ❑ ডা. সুব্রত গোস্বামী ৪০

গল্প
কে? ❑ডা. সিদ্ধার্থ গুপ্ত ৪১

চলচ্চিত্রে ডাক্তার
হস্‌পিটালঃ প্রণয় পাশে চিকিৎসক ❑ অংশুমান ভৌমিক ৪৭

বই পড়া
দ্য আর্ট অ্যান্ড সায়েন্স অফ হীলিং সিন্স অ্যান্টিকুইটি (ডা. দয়ারাম বর্মা) ❑ সত্য শিবরামন ৫০

কুইজ
অভিষেক দাস ১২

সম্পাদকীয়

পৃথিবীর গভীর অসুখ এখন...

মানুষকে বাঁচানোর চাইতে তাকে হত্যা করা ঢের বেশি সোজা। সেই পুরাকাল থেকেই মানুষ জানত বড় একটা পাথর দিয়ে মাথায় মারলেই— ব্যস! তারপর এসেছে তরবারি, তীর-ধনুক, গুলি-বন্দুক আরো কত। ভাবতে আশ্চর্য লাগে যখন প্রথম অ্যাটম বোমা ফাটল তখনও পৃথিবীতে অ্যান্টিবায়োটিকের চল হয় নি।

ক্ষুদ্র নখদন্তহীন মানুষ তার জন্মলগ্ন থেকে প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে বেঁচেছে, নিজেদের মধ্যে এত মারামারিতেও তারা শেষ হয়ে যায় নি। আলেকজান্ডার, চেঙ্গিস খান, হিটলারের আমল অবধি তার অস্ত্র তেমন শক্তিশালী ছিল না, একসাথে কয়েক কোটি মানুষের মৃত্যু ঘটানোর ক্ষমতা করায়ত্ত ছিল না। বিংশ শতকের মাঝামাঝি তার হাতে এল নিযুতহন্তা পারমাণবিক বোমা। তাকে মারণাস্ত্র বলে চিনে নিতে অবশ্য মানুষের অসুবিধা হয় নি।

কিন্তু পরমাণু বোমার প্রায় সমসাময়িক কালে আর একটি মারণাস্ত্র মানুষ আবিষ্কার করে ফেলেছে। তার নাম উন্মত্ত উন্নয়ন। এই উন্নয়নের ঠেলায় সে ওজোন স্তরে ফুটো করেছে, বহু প্রাণী-উদ্ভিদকে বিলুপ্ত করেছে, জল-স্থল-অন্তরীক্ষকে বিষাক্ত করেছে, বনবাসী-অন্তেবাসী মানুষকে উন্নয়ন উদ্বাস্তুতে পরিণত করেছে, অজস্র হৃদয়কে করেছে ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত, হিংস্র।

আমরা শুনি উন্নয়নের এই ধারণাটি ছাড়া আমাদের গতি নেই— এই উন্নয়নই হল সভ্যতা। হয়তো তাই। তবু পৃথিবীর গভীর অসুখ এখন, তাই ***স্বাস্থ্যের বৃত্তে*** আমাদের রোগ নিয়ে, চিকিৎসা নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি আলোচনা চলবে এইসব গভীর অসুখ নিয়েও।

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত লেখা সাধারণ মানুষের কাছে বিজ্ঞান, বিশেষত চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্পর্কে ধারণা পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্যে লেখা। এই পত্রিকায় প্রকাশিত লেখার ভিত্তিতে কোনো পাঠক নিজের বা অন্যের চিকিৎসা করার চেষ্টা করবেন না। সে চেষ্টা করলে ফলাফলের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবেই সংশ্লিষ্ট পাঠকের, পত্রিকার নয়।

শ্বেতী রোগের সত্যি কথা

চিকিৎসকের নিরাবেগ নির্লিপ্ত বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে শ্বেতী রোগটা নেহাত সাদা দাগ, রোগীর শরীরে কোনো ক্ষতি করে না। শ্বেতী রোগীর ডায়াবেটিস ও থাইরয়েডের অসুখ একটু বেশি হবার সম্ভাবনা আছে বলে যা একটু ভাবনা। কিন্তু রোগীর দৃষ্টিতে শ্বেতী এক মহা অভিশাপ— সমাজ শ্বেতীরোগীকে দেয় অচ্ছুত ব্রাত্য করে। সমাজচেতনার জগন্নাথের রথ হয়ত একদিন নড়বে, সেদিন শ্বেতীর দাগ নিয়েও নির্লিপ্ত থাকা যাবে— কিন্তু তার আগে পর্যন্ত শ্বেতীরোগের চরিত্র আর রোগ সারানোর পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকাই ভালো— লিখছেন **ডা. শর্মিষ্ঠা দাস**।

শ্বেতী কাকে বলে?

মেলানিন নামক রঞ্জক পদার্থটি প্রধানত মানুষের চামড়ার রঙের জন্য দায়ী। এই রঞ্জক পদার্থটি তৈরি হয় মেলানোসাইট নামক কোষে। যখন চামড়ার মেলানোসইট সম্পূর্ণ নষ্ট হওয়ার কারণে একেবারে ধবধবে সাদা দাগ দেখা যায় তাকেই বলে শ্বেতী, ইংরেজিতে ডাক্তারি পরিভাষায় ভিটিলিগো (vitiligo)।

শ্বেতী কেন হয়?

শ্বেতী রোগে চামড়ার কিছু নির্দিষ্ট অংশের মেলানোসাইট ধ্বংস হয়ে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায়। এই ধ্বংস হওয়ার কারণ নিয়ে বিভিন্ন মতবাদ আছে। তার মধ্যে যেটি দ্বারা এই প্রক্রিয়াকে সবচেয়ে ভালো ব্যাখ্যা করা যায় তা হল শরীরের স্বপ্রতিরোধ ক্ষমতার কিছু গন্ডগোলের জন্য রক্তে একপ্রকার শ্বেতকণিকা— বিশেষ ধরণের টি-লিম্ফোসাইট (T-lymphocyte) বেড়ে যায়। এই কোষগুলো মেলানোসাইট কোষদের নষ্ট করে ফেলে। স্বপ্রতিরোধ ক্ষমতার গন্ডগোলটা কেন হয় তা সঠিকভাবে এখনো জানা নেই। অল্পসংখ্যক শ্বেতী বংশগত ভাবে দেখা যায়। স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই শ্বেতী হতে পারে। ১০-৩০ বছর বয়সের মধ্যেই শ্বেতী সবচেয়ে বেশি দেখা যায়।

শ্বেতীর লক্ষণ কি?

শরীরের যে কোন অংশে বিভিন্ন আকারের একদম সাদা দাগ দেখা যায়। এই দাগ শরীরের একটি বা কয়েকটি জায়গায় স্থানিক (focal) ভাবে হতে পারে, সমস্ত শরীরের বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তৃতভাবে (genralised) হতে পারে। এই বিস্তার অনেক সময়ই শরীরের দুদিকে অনুরূপভাবে হয়— যেমন দুহাতে দুপায়ের একই জায়গায়। কখনো শরীরের একটা বিশেষ অংশ জুড়ে (segmental) সাদা দাগ দেখা দেয়। " Lip-tip" আর একটি বিশেষ ধরনের শ্বেতী— এই রোগীদের ঠোঁটে, হাত ও পায়ের প্রান্তভাগে সাদা দাগ দেখা যায়। যে অঞ্চলে শ্বেতী হয় সেই জায়গায় মেলানিনের অভাবে অনেক সময়ে চামড়ার লোমও সাদা হয়ে যায়।

শ্বেতীর সঙ্গে অন্য রোগের সম্পর্ক ও পার্থক্য কি?

শ্বেতী শরীরের স্বপ্রতিরোধ ক্ষমতার গন্ডগোলের জন্য হয়। একই কারণে অন্য কিছু কিছু অসুখ হয়; প্রায়ই দেখা যায় শ্বেতী রোগীদের শরীরে শ্বেতীর সঙ্গে ওইসব অসুখও থাকে— যেমন থাইরয়েড গ্রন্থির সমস্যা, ডায়াবেটিস। ওইসব রোগের বাড়া কমার উপর কিন্তু শ্বেতীর গতিপ্রকৃতি একেবারেই নির্ভর করে না। শুধু একই কারণে হওয়ার জন্য এই সমউপস্থিতি। শ্বেতী রোগীদের থাইরয়েড ও সুগার পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া ভাল। ঐ রোগগুলি তাড়াতাড়ি ধরা পড়ে গেলে নির্দিষ্ট চিকিৎসাও তাড়াতাড়ি শুরু করা যায়।

পুড়ে যাওয়ার পরে বা অন্য কারণে গভীর ক্ষত হওয়ার পরে শ্বেতীর মতো সাদা দাগ দেখা যায়— এইসব ক্ষেত্রে পোড়া বা ক্ষত চামড়ার যে স্তরে মেলানোসাইট কোষ আছে সেই স্তরকে একেবারে নষ্ট করে ফেলে। তাই সেই জায়গার স্বাভাবিক রঙ নষ্ট হয়ে গিয়ে শ্বেতীর মতো দেখায়— একে বলে 'লিউকোডার্মা'। এই দাগ সারাজীবন শুধু আক্রান্ত জায়গায় সীমাবদ্ধ থাকে— শ্বেতীর মতো কোনো আভ্যন্তরীণ কারণে হয় না বলে অন্য কোনো অংশে ছড়িয়ে পড়ে না।

শ্বেতীর প্রাথমিক স্তরে যতক্ষণ না ত্বক ধবধবে সাদা হয়ে যায় ততক্ষণ অন্য কয়েকটি রোগের সাদা দাগের সঙ্গে একে আলাদা করে চেনা মুশকিল। যেমন— ছুলি, কুষ্ঠরোগের সাদা দাগ, কিছু সাদা জড়ুল।

অ্যালবিনিজম (Albinism) ব্যাপারটা কিন্তু শ্বেতীর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। অ্যালবিনো মানুষদের শরীরে জন্ম থেকেই মেলানোসাইট কোষে উৎসেচকঘটিত কিছু গন্ডগোলের জন্য মেলানিন প্রস্তুত করার ক্ষমতা থাকে না। অ্যালবিনিজম বংশগত ভাবে বাহিত হয়। জন্ম থেকে অ্যালবিনোদের শরীরের সমস্ত অংশের চামড়া, সব চুল ধবধবে সাদা হয়; এমনকি চোখের মণির স্বাভাবিক কোনো রঙ থাকে না। প্রাচীনকালে শ্বেতীকে 'ধবল কুষ্ঠ' বলা হত— কুষ্ঠরোগের সঙ্গে কিন্তু শ্বেতীর কোনো রকম সম্পর্ক নেই।

শ্বেতীর চিকিৎসা কি? শ্বেতী কি সারে?

প্রথম কথা হল শ্বেতী একটি দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা। প্রতিটি রোগীর ক্ষেত্রে এই রোগের গতিবিধি ভিন্ন। অর্থাৎ একই চিকিৎসায় হয়তো কারো সম্পূর্ণ ভালো হয়ে গেল, কারো কিছুটা কমল, আবার কারো হয়তো দেখা গেল রোগ নিজের গতিতেই বিস্তৃতভাবে ছড়িয়ে পড়ল। কুষ্ঠরোগ জীবাণুঘটিত রোগ বলে রোগীকে শতকরা প্রায় একশো ভাগ আশ্বস্ত করা যায় যে ঠিকমতো ওষুধ খেলে রোগ সারবেই। শ্বেতীর ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাপারটা সেরকম নয়। তবে এটুকু

আশ্বাস দেওয়া যায় যে শ্বেতী একেবারেই ছোঁয়াচে নয়, 'সাদা দাগ' ছাড়া রোগীর শরীরে কোনো কষ্ট বা সমস্যা সৃষ্টি হবে না, খুব কম ক্ষেত্রেই এ রোগ বংশগত আর বেশিরভাগ রোগীরই চিকিৎসার দ্বারা উপকার হয়।

তবু রোগীকে প্রতিনিয়ত ওই দাগের জন্য নানা প্রশ্ন, অযাচিত উপদেশ ও সামাজিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এমনও দেখেছি যে— চল্লিশোর্ধা ক্যান্সার আক্রান্তা রোগিনী ক্যান্সারের চাইতে তার ছোট দু -একটা সাদা দাগ নিয়ে বেশি চিন্তিত ও বিব্রত! মন খারাপ হয় যখন শুনি অবিবাহিতা যুবতী শ্বেতীর কারণে অবসাদে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে। রোগটা সম্পর্কে কিছুটা জানা থাকলে হয়তো এগুলো অনেকটা আটকানো যাবে।

- শ্বেতী চামড়ার সাদা দাগ। চিকিৎসা না করালেও রোগীর শারীরিক ক্ষতি কিছু নেই।
- শ্বেতী ছোঁয়াচে নয়, অধিকাংশ শ্বেতী রোগীর বংশে এ রোগের ইতিহাস পাওয়া যায় না। কুষ্ঠের সঙ্গে শ্বেতীর কোনো সম্পর্ক নেই।

এবার প্রচলিত বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা নিয়ে আলোচনায় যাওয়া যাক

একটি বা অল্প কয়েকটি দাগ থাকলে সাদা দাগে স্টেরয়েড মলম লাগাতে হবে। এই চিকিৎসা নিজে করার চেষ্টা বিপজ্জনক। সুতরাং চিকিৎসকের পরামর্শ নিতেই হবে। আর শ্বেতী ছড়িয়ে পড়ছে বা অনেক জায়গায় শ্বেতী হয়েছে এমন ক্ষেত্রে মুখে খাবার স্টেরয়েড বা স্টেরয়েড ইঞ্জেকশান দরকার হতে পারে। দরকার হতে পারে শরীরের স্ব-প্রতিরোধ ব্যবস্থার হানি করে এমন কিছু জোরালো ওষুধ। বলাই বাহুল্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের নিয়মিত তত্ত্বাবধান ছাড়া এসব ওষুধ চালানো যায় না। বিভিন্ন ধরনের স্টেরয়েড মলম আছে। সাদা দাগের স্থান অনুযায়ী চিকিৎসক নির্বাচন করবেন কতটা জোরালো স্টেরয়েড লাগাবেন।

চামড়ার রঙ ফিরে আসা শুরু হয় দুভাবে। একটা হতে পারে দাগের ধার থেকে আস্তে আস্তে কালো হয়ে দাগটা ক্রমে ছোট হয়ে এল; অথবা সাদা দাগের মধ্যবর্তী লোমকূপ অঞ্চলে বিন্দু বিন্দু কালো রঙের ছোপ দেখা গেল। ট্যাক্রোলিমাস, পাইমেক্রোমিলাস মলমেও শ্বেতীতে উপকার পওয়া যায়। এগুলোও চিকিৎসকের পরামর্শ না নিয়ে লাগানো উচিৎ নয়।

PUVA (P- Psoralen, UVA-Ultaviolet A) থেরাপি দীর্ঘদিন ধরে সোরিয়াসিসের ও শ্বেতীর

চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়ে আসছে এবং কার্যকরী হতেও দেখা গেছে। সোরালেন জাতীয় ওষুধ যেমন—৫ মেথোক্সিসোরালেন বা ৮ মেথোক্সিসোরালেন খেতে হয়। ওষুধটি খাবার ঘন্টাদুয়েক পরে আক্রান্ত জায়গায় আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি লাগাতে হয়। UVA রশ্মি মেশিন দ্বারা (অন্তত সপ্তাহে তিন দিন) সাদা দাগের উপর প্রক্ষেপণ করা যায়। আবার সূর্যালোকেও UVA রশ্মি পাওয়া যায়। ভারতের মতো পর্যাপ্ত সূর্যকিরণের দেশে সূর্যের আলোকে কাজে লাগনোই ভালো। কারণ তা নিখরচায় পাওয়া যায় ও রোগী ডাক্তারের চেম্বারে না গিয়ে নিজের সুবিধা মতো রোদ লাগাতে পারে। তবে সমস্যা হল মেশিন দিয়ে যেমন নির্দিষ্ট মাপ মতো UVA দেওয়া যায়, সূর্যালোকে তা সম্ভব নয়। আবার বিশেষ ল্যাম্প দ্বারা স্বল্পদৈর্ঘ্যের আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মিকে কাজে লাগানো হয়। সেটা কিন্তু সূর্যের আলো দিয়ে মোটেই সম্ভব নয়।

কিছু কিছু রোগীর ক্ষেত্রে শরীরের বেশির ভাগ অঞ্চলই সাদা হয়ে যায়, খুব অল্প কিছু জায়গায় ছোপ ছোপ স্বাভাবিক চামড়া থাকে। তাদের ক্ষেত্রে অনেক সময় উল্টো পদ্ধতিতে চিকিৎসা করা হয়— অর্থাৎ স্বাভবিক কালো দাগগুলোকে সাদা করে দেওয়া হয় যাতে সমস্ত শরীরের ত্বকের রঙ একই রকম সাদা হয়ে যায়।

শ্বেতীতে সার্জারির ভূমিকা কি?

'মিনি গ্রাফটিং' বা ছোট প্রতিস্থাপন ব্যাপারটা শ্বেতীর চিকিৎসায় বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এই চিকিৎসায় বিভিন্ন পদ্ধতিতে অন্য জায়গা থেকে অতিক্ষুদ্র চামড়া বা মেলানোসাইট কোষ সাদা দাগে প্রতিস্থাপিত করা হয়। তবে এই পদ্ধতি প্রযোজ্য শুধু কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে। প্রথমত শ্বেতীর দাগ অল্প কিছু জায়গায় সীমাবদ্ধ হতে হবে আর বেশ কিছু দিন যাবৎ লক্ষ্য রাখতে হবে যে দাগ শুধু ওই নির্দিষ্ট জায়গাতেই সীমাবদ্ধ থাকছে, শরীরের অন্য কোনো অংশে ছড়িয়ে পড়ছে না। মিনি গ্রাফটিং ছাড়াও অন্য অনেকভাবে শ্বেতীগ্রস্ত অঞ্চলে নিজের শরীরের স্বাভাবিক (কালো) ত্বক প্রতিরোপণ করা যায়। কিন্তু পদ্ধতি যাইহোক না কেন, শল্যচিকিৎসায় ভালো ফল পাওয়া যায় উপরোক্ত বিশেষ ক্ষেত্রগুলোতেই।

কোন ধরনের শ্বেতী চিকিৎসা দ্বারা কেমন উপকৃত হয়?

হাড়ের উপরের (যেমন কনুই, হাঁটু, গোড়ালির হাড়) চামড়ায় শ্বেতীর দাগ মেলাতে অন্যান্য জায়গার চাইতে বেশি সময় লাগে। একটি বা দু চারটি দাগ থাকলে সাধারণত চিকিৎসায় ভালো ফল পাওয়া

- শ্বেতীর চিকিৎসা চলে বহুদিন। মলম, খাবার ওষুধ, সূর্যের রোদ লাগানো বা যন্ত্র দিয়ে অতিবেগুনি রশ্মি প্রয়োগ— এগুলোই মূল চিকিৎসা।
- কিছু কিছু ক্ষেত্রে শ্বেতী সারানোয় শল্যচিকিৎসার ভূমিকা রয়েছে।

যায়। ঠোঁট ও আঙুলের প্রান্তভাগে শ্বেতীর চিকিৎসায় তেমন সাড়া মেলে না। বিস্তীর্ণ অঞ্চলে শ্বেতীর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। শুধু ঠোঁটের শ্বেতীতে খাওয়ার ওষুধ বা মলমে কাজ না হলে প্রতিস্থাপনের কথা চিন্তা করা যেতে পারে

শ্বেতী রোগে কি কি বিধি-নিষেধ আছে?

যেকোনো রোগের মতো শ্বেতীর ক্ষেত্রেও রোগীর প্রথম জিজ্ঞাসা থাকে— ''ডাক্তারবাবু কি খাওয়া বারণ?'' ভিটামিন সি-র কিছুটা মেলানিন বিরোধী ভূমিকা আছে বলে আগে শ্বেতীরোগীদের ফল খেতে বারণ করা হত। কিন্তু তাতে রোগের উন্নতির ক্ষেত্রে হেরফের হয় না বলে বর্তমানে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে কোনো বিধি-নিষেধ নেই। শ্বেতী রোগী সবকিছুই খেতে পারেন।

শ্বেতী রোগীরা প্রায়ই একটা অভিযোগ করেন— ''এই জায়গাটা কেটে গেছিল, তারপর সাদা দাগ হয়ে গেছে, আর মেলাচ্ছে না।'' এটা আসলে শ্বেতীর একটা ধর্ম। শ্বেতী ছাড়া আরও কিছু চর্মরোগের ক্ষেত্রেও এটা দেখা যায় যে কেটে যাওয়া, ছড়ে যাওয়া এমনকি জোরে ঘসা বা চুলকানোর জায়গাতে রোগের লক্ষণ ফুটে ওঠে। সেজন্য শ্বেতী রোগীদের চামড়া যাতে ছিঁড়ে কেটে না যায় সেব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত, নয়তো সেইসব অঞ্চলে নতুন করে সাদা দাগ দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা

থাকে। মেয়েদের শায়া বা চুড়িদারের দড়ি কোমরে খুব টাইট করে বাঁধা উচিত নয়— কোমরে দড়ি বাঁধার জায়গা বরাবর সাদা দাগ দেখা দিতে পারে। হাতে বড় নখ রেখে নখ দিয়ে চুলকানোও একই কারণে ঝুঁকিপূর্ণ। যেসব রোগীর সোরালেন জাতীয় ওষুধ খাইয়ে চিকিৎসা চলছে তাঁদের রোদে বেরোনোর আগে শরীরের অনাবৃত অংশে সানস্ক্রীন লোশন/মলম মাখতে হবে, কারণ সেইসব অংশ সোরালেন জাতীয় ওষুধ ও সূর্যালোকের প্রভাবে বেশি কালো হয়ে যেতে পারে। আর সাদা দাগের জায়গায় অতিরিক্ত সূর্যরশ্মির প্রভাবজনিত পরিবর্তন দেখা দিতে পারে যেহেতু এখানে মেলানিনের সুরক্ষা আবরণীও নেই। যাঁরা সোরালেন জাতীয় ওষুধ খান তাঁদের রোদে বেরোনোর সময় রোদচশমা ব্যবহার করতে হবে।

- শ্বেতীর সঙ্গে কখনো সখনো অন্য অসুখ থাকতে পারে— বিশেষত ডায়াবেটিস ও থাইরয়েডের অসুখ।
- শ্বেতী কোনো কোনো ক্ষেত্রে চিকিৎসায় ভালো সাড়া দেয়, পুরো/প্রায় পুরো সেরে যায়। আবার কোনে কোনো ক্ষেত্রে বিশেষ সাড়া দেয় না।
- অভিজ্ঞ ডাক্তাররা রোগী দেখে চিকিৎসায় ফল হবে কিনা সেটা খানিকটা আন্দাজ করতে পারেন, কিন্তু জোর দিয়ে বলতে পারেন না।

শেষ কথা

শ্বেতী রোগে ডাক্তারের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব রোগীর সঙ্গে কথা বলা— তাঁর সমস্যা বোঝা ও তাঁকে বোঝানো, এককথায় কাউন্সেলিং-এর মাধ্যমে রোগীর মনোবল বাড়ানো। সমাজে, লোকজনের মধ্যে ''শ্বেতী কোনো ক্ষতিকারক ছোঁয়াচে রোগ নয়'' এই বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া দরকার। চিকিৎসা করানোর সঙ্গে সঙ্গে রোগীকে এই সাদা দাগ ও তা নিয়ে অন্যের মন্তব্যকে উপেক্ষা করতে শিখতে হবে। মনে রাখতে হবে শ্বেতী জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই কোনো প্রতিবন্ধকতা নয়।

লেখক পরিচিতিঃ ডা. শর্মিষ্ঠা দাস, এম বি বি এস, ডি ভি ডি, চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ। একটি সরকারি হাসপাতালের চর্মরোগ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক।

advt.

Acne, HairFall, Vitiligo – Do **NOT** Despair.

All are Treatable.

Consult your Dermatologist

ALKEM DERMA CARE

(Adding Value to Skin Care)

A Division of **Alkem** Laboratories Ltd

পা ফুলে ঢোল

পায়ের দিকে এমনিতে আমরা নজর দিই না। কিন্তু পা যখন ফুলতে থাকে তখন সেদিকে মনোযোগ না দিয়ে উপায় থাকে না। সামান্য শিরার সামান্য রোগে পা ফুলতে পারে, আবার পা ফুলতে বারে বৃক্ক বা হৃদযন্ত্রের প্রাণঘাতী রোগেও। কোন্ রোগ মেঘনাদের মতো আড়ালে লুকিয়ে আছে তা ধরার জন্য ডাক্তারবাবু ভালো করে রোগীকে দেখবেন— তার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। তারপর হয়তো কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা। পা ফোলাকে অবজ্ঞা করলে বিপদে পড়তে পারেন, আবার এ নিয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হওয়ারও কোনও কারণ নেই— জানাচ্ছেন **ডা. রুদ্রেন্দু ভট্টাচার্য**।

মাঝে-মধ্যেই পা ফোলা নিয়ে আমাদের ব্যতিব্যস্ত হতে হয়। পায়ে চটি পরা যাচ্ছে না, আঙুল দিয়ে টিপলে পায়ের চামড়া বসে যাচ্ছে। কখনও বা একপায়ে, কখনও বা দুপায়ে। কেউ বলে গোদ হয়েছে, কারও বক্তব্য হার্ট স্পেশালিস্ট দেখিয়ে নাও, কেউ বলে থাইরয়েড চেক করিয়েছো তো? তাই বেশিরভাগ মানুষই এই ব্যাপারে ভীষণ দোদুল্যমানতায় ভোগেন— বুঝতে পারেন না ঠিক কী করা উচিত।

পা ফোলে কেন?

পা ফোলা সম্বন্ধে জানতে হলে আমাদের জানা দরকার রক্তসংবহন পদ্ধতি সম্বন্ধে। বাড়িতে যেমন জল সরবরাহের জন্য পাম্প থাকে তেমনই আমাদের শরীরে আছে হৃদপিন্ড। মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে অতিক্রম করে সে রক্তকে মাথা বা মুখমন্ডলীতে প্রবেশ করায় আবার সংবহিত রক্তকে নিচ থেকে হৃদযন্ত্রে টেনে নিয়ে আসে। হৃদযন্ত্র থেকে যে নালীর মধ্যে দিয়ে রক্ত সংবহিত হয় তাকে বলে ধমনী আর যে নালী দিয়ে রক্ত ফিরে আসে তাকে বলে শিরা। এই প্রক্রিয়া মায়ের জঠর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সারাজীবন চলতে থাকে।

এবার আসা যাক পা ফোলার কথায়। কখনও কারও দুই পা ফোলে কখনও বা এক পা। কেউ বলেন হঠাৎ করে পা ফুলে গেল। কারও বা বক্তব্য আস্তে আস্তে পা ফুলেছে। আঙুল দিয়ে টিপলে কারও পায়ের চামড়া গর্তের মতো বসে যায়। কারও বা পা ফুলেই থাকে; টিপলেও গর্ত হয়ে বসে যায় না।

এইসব ভিন্ন ভিন্ন উপসর্গের কারণ ভিন্ন ভিন্ন। প্রথমেই শারীরবৃত্তীয় ব্যাপার দেখা যাক। সাধারণত হৃদযন্ত্র পাম্প করে শরীরের মধ্যে রক্ত সংবহন করে। তাই কোনো কারণে হার্টের কর্মক্ষমতা কমে গেলে রক্ত নিচ থেকে ওপরে যেতে পারে না। রক্ত জালিকার মধ্যে দিয়ে রক্তের তরল অংশ পায়ের দিকে জমতে থাকে ফলে পা ফুলতে থাকে। পা ফোলাটা সকালের দিকে কম থাকে। যত বেলা বাড়ে, অন্য যে কোনও তরলের মতো রক্তও শরীরের নিচের দিকে, অর্থাৎ পায়ের দিকে জমা হবার প্রবণতা দেখায়। তখন তাকে টেনে তুলতে হৃদযন্ত্রকে বেশি কাজ করতে হয়, ফলে ফোলা ভাব বাড়তে থাকে। কিডনির রোগে ব্যাপারটা আবার অন্যরকম। কারণ কিডনির রোগে শরীর থেকে প্রোটিন প্রস্রাবের সাথে বেরিয়ে যেতে থাকে; ফলে শরীরে প্রোটিন কম হয়ে যায়। রক্তের

ঘনত্ব যেহেতু কম হয়ে যায়, রক্ত থেকে জলীয় অংশটি অভিস্রবণ পদ্ধতিতে রক্তনালীর ভেতর থেকে বেরিয়ে চারপাশের কোষের মাঝখানকার ফাঁকে জমা হতে থাকে। এটা অভিকর্ষের কারণে শরীরের নিচের দিকে বেশি হয়। যেহেতু সব থেকে নিচের অংশ পা তাই পায়ের অংশটাই বেশি ফোলে। এক্ষেত্রে সারারাত শুয়ে থাকার পরেও সকালের দিকেও পা ফোলা তেমন কম হয় না।

এবার আসা যাক থাইরয়েড রোগের ক্ষেত্রে। থাইরয়েড রোগের ক্ষেত্রে এক ধরণের পদার্থ পায়ের দিকে জমা হয় ফলে পা ফুলতে থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে আঙুল দিয়ে টিপলে পায়ের ত্বক বসে গর্ত হয়ে যায় না।

শরীরে রক্ত ছাড়া আর এক ধরণের তরল পদার্থ থাকে তার নাম লসিকা। কোনো কারণে লসিকা সংবহনে বাধার সৃষ্টি হলে সেই লসিকা আর উপরে উঠতে পারে না। ফলে পায়ের দিকে লসিকা জমতে থাকে। আমাদের দেশে লসিকা নালীতে বাধা পড়ার খুব সাধারণ কারণ হল ফাইলেরিয়া। ফাইলেরিয়াতে একটি মাত্র পা ফোলাই বেশি দেখা যায়।

আমাদের দেশ গরীব দেশ। আর আমাদের দেশের বাচ্চারা প্রায়ই ভোগে অপুষ্টিতে। এই অপুষ্টিজতি রোগের মধ্যে অন্যতম হল কোয়েশিয়রকর। এই রোগে শরীরে প্রোটিন কমে যায়। ফলে রক্তে প্রোটিন কম থাকে, এবং অভিস্রবণ প্রক্রিয়ার ফলে শরীরের রক্তরস শরীরের কোষকলায় জমা হয়। অভিকর্ষের কারণে এই জমা রস পায়ের দিকে বেশি জমা হয়— ফলে পা যায় ফুলে।

ক্যান্সারের ক্ষেত্রে আবার ক্যান্সার কোষ গিয়ে জমা হয় সংবহন নালীতে, ফলে রক্ত সংবহন ব্যাহত হয়। তখন রক্তরসের প্রবাহ বন্ধ হয়ে রক্তরস পায়ের নিচের দিকে কোষকলায় জমতে থাকে। ফলে পা ফোলা শুরু হয়।

এছাড়াও আরেকটা কারণ হল ডিপ ভেন থ্রম্বোসিস বা পায়ের গভীর শিরার মধ্যে অর্ন্তঃক্ষন। এক্ষেত্রে কোনো কারণে জমাট বাঁধা

পা ফোলার সাধারণ কারণ

- শিরার রোগ, ফাইলেরিয়া, বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে বা পা ঝুলিয়ে বসে থাকা
- অপুষ্টি, ফাইলেরিয়া, থাইরয়েডের রোগ
- কখনও সখনও কিডনির অসুখ বা হৃদযন্ত্রের রোগ

রক্ত রক্তের সংবহনে বাধা সৃষ্টি করে। আর এর ফলে পায়ের গোছার জায়গাটা ফুলে যায় এবং যন্ত্রণা হতে থাকে। এই রোগ নির্ণয় যত তাড়াতাড়ি করা যায় ততই ভালো, কারণ কোনো কারণে এই তঞ্চিত রক্তপিন্ড শিরার ভেতরকার গা থেকে খুলে এসে রক্তের সঙ্গে বড় শিরার মধ্যে প্রবাহিত হতে পারে, এবং তা শেষ পর্যন্ত ফুসফুসীয় শিরার মধ্যে দিয়ে ফুসফুসে পৌঁছাতে পারে। তখন এই তঞ্চিত রক্তপিন্ড গিয়ে ফুসফুসের সংবহনে বাধা তৈরি করলে পালমোনারি এমবলিজম নামক ভয়ংকর এবং প্রাণঘাতী রোগ হতে পারে।

চিকিৎসা

এখন এই অবস্থায় নিরাময় সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা যাক।

প্রথমত হার্ট ফেলিওরের ক্ষেত্রে যে কারণের জন্য হার্ট ফেলিওর হয়েছে তার কারণ অনুসন্ধান করেই চিকিৎসা করতে হবে। যেমন বেশি নুন খেলে রক্তরসের মোট পরিমাণ বেড়ে যায়। তখন এই বেশি পরিমাণ রক্ত সারা শরীর জুড়ে সঞ্চালন করতে গিয়ে হৃদপিন্ডের উপর চাপ পড়তে পারে। এছাড়া যদি রক্তচাপ বৃদ্ধির জন্য হার্ট ফেলিওর হয় তবে রক্তচাপ বৃদ্ধির ওষুধ খেতে হবে। কোনো কারণে যদি থাইরয়েড রোগের জন্য হার্ট ফেলিওর হয় তবে থাইরয়েড স্বাভাবিক করার জন্য ওষুধ খেলেই হার্ট ফেলিওর ঠিক হয়ে যাবে। আবার হৃদযন্ত্রের মাংসপেশিতে অক্সিজেন সরবরাহ হয় কতকগুলি ধমনী দিয়ে। সেইসব ধমনী সরু হয়ে গেলে বা বন্ধ হয়ে গেলে, হৃদযন্ত্রের মাংসপেশির কর্মক্ষমতা কমে যায়, এমনকি হৃদমাংসপেশির মৃত্যু হয়ে সেটি পুরো অকেজো হয়ে যেতে পারে। তখন হার্ট ফেলিওর হয়। এক্ষেত্রে হৃদযন্ত্রের ধমনীতে রক্ত চলাচল বৃদ্ধি করার জন্য চিকিৎসা করা উচিত। কিছু ক্ষেত্রে নানা কারণে হৃদযন্ত্রের কর্মক্ষমতা কমে গেলে হার্ট ফেলিওর হয়। সেক্ষেত্রে হৃদযন্ত্রের কার্যক্ষমতা বাড়ানোর জন্য চিকিৎসা করলে সেই কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং হার্ট ফেলিওর ঠিক হতে পারবে। এছাড়া যদি কিডনির রোগের কারণে অথবা লসিকা প্রবাহের বাধা সৃষ্টি হলে পা ফোলে, সেক্ষেত্রে এই কারণের চিকিৎসা করালে পা ফোলা নিরাময় হতে পারে। অপুষ্টির কারণে পা ফুলে গেলে, উত্তম প্রোটিনযুক্ত খাবার খাওয়ানো উচিত। বাজার চলতি কোনো টনিক বা হেলথ ফুডের বদলে স্বাভাবিক খাবারদাবার যেমন ছোলা, দুধ, মাছ ইত্যাদি খাওয়ালেই পা ফোলা কমে যায় এবং কম পয়সায় সহজেই অপুষ্টি সারবে।

বেশি খরচ মানেই কি ভালো চিকিৎসা?

বিশেষ একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করে এই লেখা শেষ করছি। একজন রোগী আমার কাছে এসেছিলেন তাঁর করোনারি বাইপাসের ব্যাপারে পরামর্শ নিতে। বড় বড় হাসপাতালে দেখিয়েছেন। প্রচুর ব্যবস্থাপত্র আর পরীক্ষার রিপোর্ট দিয়ে ফাইলও বানানো হয়ে গেছে। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি যে তাঁর কষ্ট কী? তিনি আমাকে বললেন হাঁটতে গেলে তাঁর শ্বাসকষ্ট হয়, আর তাঁর পা ফুলেছে। ডাক্তাররা তাঁকে বলেছেন এর কারণ হার্ট ফেলিওর। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা নিদান দিলেন— 'আপনার হৃদযন্ত্রের মাংসপেশিতে রক্ত ও অক্সিজেন সরবরাহ করে যেসব ধমনী (অর্থাৎ করোনারি আর্টারি), তাতে সমস্যা আছে। কী

পা ফোলার বিপদ

- কারণ খুঁজে বার করা ও কারণের চিকিৎসা
- রোগীকে ভালো করে পরীক্ষা
- দরকারে ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা

সমস্যা সেটা নির্ণয় করার জন্য হবে অ্যাঞ্জিওগ্রাফি— বহু টাকা খসবে— এবং অ্যাঞ্জিওগ্রাফিতে যে করোনারি আর্টারিতে কোথাও কোনো বাধা (থ্রম্বাস) পাওয়া যাবে এব্যাপারে হৃদরোগবিশেষজ্ঞ প্রায় সুনিশ্চিত। সুতরাং তিনি বলে রেখেছেন— রোগী যেন বাইপাস সার্জারির (দু লক্ষ টাকা খরচ) জন্য প্রস্তুত থাকেন।

আমি কাগজগুলো দেখতে গিয়ে দেখি তাঁর হাইপো-থাইরয়েড আছে, অর্থাৎ থাইরয়েড গ্রন্থির ক্ষরণ অনেক কম। তাঁকে বারবার জিজ্ঞাসা করি যে তাঁকে কোনো ডাক্তারবাবু থাইরয়েডের ওষুধ দিয়েছেন কিনা। তিনি বারবার বলতে থাকেন যে তাঁকে থাইরয়েডের ওষুধ তো দেওয়া হয় নি এমনকি তাঁকে থাইরয়েডের কোন অসুখ আছে এমন কথা বলাই হয় নি। তখন আমি তাঁকে থাইরয়েডের হরমোন ঠিক করার ওষুধ দিই, অল্প কয়েক টাকা দাম। ওষুধটি কিছুদিন খাবার পরেই তিনি সুস্থ বোধ করতে থাকেন। এখনও তিনি বহাল তবিয়তে আছেন আর তাঁর পা ফোলা সেরে গেছে। অর্থাৎ থাইরয়েড হরমোন কম ক্ষরণের জন্যই তাঁর পা ফুলেছিল এবং শ্বাসকষ্টও একই কারণে হচ্ছিল। মাসে মাত্র ২৫/৩০ টাকার ওষুধ খেয়ে তিনি ভালো হয়ে গেলেন। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের ভুল না কি কর্পোরেট সেক্টরের ধোঁকাবাজি— তা আমি জোর গলায় বলতে পারব না। তবে আশঙ্কা হয় তাঁর মতো অনেক রোগীর বুকের রক্ত জল করে উপার্জন করা দু-তিন লাখ এভাবে অন্য পকেটে চলে যাচ্ছে। তাই কোনও রোগীকে 'বাইপাসের পেশেন্ট' হিসাবে না দেখে অথবা তাঁর বিল কত উঠবে সেদিকে নজর না দিয়ে রোগী হিসাবেই ডাক্তারদের চিকিৎসা করতে হবে। নইলে রোগীদের আস্থা তো আমরা হারাবোই, দিনের শেষে আয়নায় নিজের মুখ দেখেও হয়তো আমাদের বুক কেঁপে উঠবে।

লেখক পরিচিতিঃ ডা. রুদ্রেন্দু ভট্টাচার্য, এম বি বি এস। কেন্দ্রিয় সরকারের হাসপাতালে বহু বছর ধরে কর্মরত।

পিউবার্টি ডিসমেনোরিয়া— কিশোরীদের ঋতুস্রাবকালীন ব্যথা

বারো-তেরো বছরের মেয়ে— বাবা-মা'র কাছে যেন ভোরে জানালায় রোদ্দুর। সে যখন ঋতুস্রাবের দিন ক'টা তলপেটে ব্যথা নিয়ে কাতরায়, তখন সবার চোখে অমাবস্যা। কিন্তু আশ্চর্য হল বাচ্চা-বুড়ো কেউ এ নিয়ে ভালো করে জানতে চান না। এ যেন এক নিষিদ্ধ আলোচনা— এক ট্যাবু। ট্যাবুর কালো পর্দা সরালে দেখব ব্যাপারটা তেমন কঠিন কিছু নয়, ভয়ের তো নয়ই—

লিখছেন **ডা. কাঞ্চন মুখার্জী**

এ যেন প্রতি মাসে একই গল্প। আপনার বাড়ির ফুটফুটে মেয়েটি বয়স এগারো কি বারো। কখনো একটু বেশি বা কম। সাধারণত বাড়ি মাতিয়ে রাখে। কিন্তু মাসের ঐ ক'টা দিন সে যন্ত্রণায় কাতরায়। স্কুল যেতে পারে না। ব্যথায় কুঁকড়ে

শুয়ে থাকে বিছানায়। ঋতুস্রাব যেন এক বিভীষিকা তার কাছে। কিন্তু কেন? কোনো ভাবে কি এই কিশোরীটিকে একটু সাহায্য করা যায় না?

আপনি একা নন। আপনার মতো অনেকেরই বাড়িতে টিন এজার মেয়েরা পিউবার্টি ডিসমেনোরিয়ায় (Puberty Dysmenorrhea) ভোগে। কমবেশি ৫০ শতাংশ মেয়ে এই দুঃসহ অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যায়। কারও হয়তো জীবনের প্রথম ঋতুচক্র থেকেই ব্যথা শুরু হয়ে যায়। কারও বা কয়েক মাস পরে। পরিসংখ্যান-মাফিক টিন এজার মেয়েদের স্কুল কামাই-এর সবচেয়ে বড় কারণ হল ঋতুকালীন ব্যথা। সাধারণ সর্দি-কাশি-জ্বরের চেয়েও বেশি। তবু এহেন রোগের প্রতি সচেতনতা আমাদের সমাজে ভীষণ কম। কিশোরীদের মধ্যে তো বটেই, তাদের বাবা-মায়েদেরও এ সম্পর্কে ধারণা অত্যন্ত সীমিত।

ঋতুচক্রের সময় সামান্য একটু ব্যথা সকলেরই হয়। তবে 'ডিসমেনোরিয়া' আমরা তাকেই বলব যখন এই ব্যথা মেয়েদের দৈনন্দিন কাজকর্মে বাধা দেয় বা ওষুধ খেয়ে ব্যথা কমতে হয়। 'ডিসমেনোরিয়া' দুই ধরণের— প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি।

ব্যথার কোনো সরাসরি কারণ খুঁজে না পাওয়া গেলে তাকে বলা হয় প্রাইমারি ডিসমেনোরিয়া— প্রায় ৯০-৯৫ শতাংশ মেয়ের ঋতুস্রাবকালীন ব্যথা এই গোত্রে পড়ে। মাসিকের সময় শরীরের 'প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন' নামে এক বিশেষ ধরণের রাসায়নিকের প্রভাবে জরায়ুর পেশির অত্যধিক সংকোচনের জন্য এই ব্যথার উদ্রেক হয়— তবে এর ফলে শরীরে দীর্ঘস্থায়ী কোনো ক্ষতি হয় না। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যথা কমেও আসে।

টিন এজার মেয়েদের স্কুল কামাই-এর সবচেয়ে বড় কারণ হল ঋতুকালীন ব্যথা। সাধারণ সর্দি-কাশি-জ্বরের চেয়েও বেশি

এসব ক্ষেত্রে মা-বাবা বা বাড়ির কোনো বয়স্ক মহিলা যদি কিশোরিটিকে অভয় দেন— ভয় পাস না এরকম তো সবার হয়— তাহলে সে নিজেই মানসিক জোর খাটিয়ে ব্যথাকে ঘাড় থেকে নামাতে পারে। প্রয়োজন হলে ডাক্তারের পরামর্শ মাফিক আইবুপ্রোফেন, মেফেনামিক অ্যাসিড ইত্যাদি ব্যথা কমানোর NSAID গোত্রের ওষুধ খাওয়া যেতে পারে। এরা শরীরে প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন তৈরিতে বাধা দেয়। খালি পেটে এই ওষুধ খেলে ওপর পেটে একটু ব্যথা হতে পারে। সুতরাং এইগুলি সবসময় ভরা পেটে খেতে হয়। বেশিমাত্রায় খেলেও কিছু কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। তাই চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া নিজেরাই পুরানো প্রেসক্রিপশান দেখিয়ে ওষুধের দোকান থেকে বার বার একই ওষুধ খাবেন না। সাধারণ ওষুধে কাজ না হলে ডাক্তাররা অল্প কিছু দিনের জন্য হরমোন ট্যাবলেট দিতে পারেন। এতে ঘাবড়ানোর কোন কারণ নেই।

এবার আসি 'সেকেন্ডারি ডিসমেনোরিয়া' প্রসঙ্গে। মাসিকের ব্যথায় ভোগেন এরকম মেয়েদের মধ্যে ৫-১০ শতাংশের ক্ষেত্রে এন্ডোমেট্রিয়োসিস, ফাইব্রয়েড, ওভারিয়ান সিস্ট ইত্যাদি সমস্যা খুঁজে পাওয়া যায়। মাসিকের ব্যথা যখন অন্য কোনো রোগের কারণে হয় তখন তাকে বলা হয় সেকেন্ডারি ডিসমেনোরিয়া। অভিজ্ঞ হাতে উন্নতমানের মেশিনে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি (USG) করালেই সাধারণত এসব রোগ ধরা পড়ে। এই পরিস্থিতিতেও ঘাবড়ানোর কিছু নেই। আজকাল এই সব রোগে খুব ভালো চিকিৎসা পাওয়া যায়। নির্দিষ্ট চিকিৎসা পদ্ধতি অবশ্যই হবে সঠিক ডায়গনোসিসের উপর ভিত্তি করে। তবে প্রাথমিকভাবে ব্যথা কমানোর জন্য আইবুপ্রোফেন জাতীয় NSAID ওষুধ পরিমিত মাত্রায় ব্যবহার করা যেতে পারে।

টিন এজার মেয়েরা নানারকম শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায়। প্রতিটি পরিবারের কাছেই তারা এক অমূল্য সম্পদ। তাদের উপস্থিতি যেন বাড়িটিকে আলো ঝলমল করে রাখে। প্রতি মাসে চার-পাঁচ দিন করে তারা কষ্ট পেলে সমগ্র পরিবারই অস্থির হয়ে পড়েন। মনে রাখবেন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঋতু যন্ত্রণা কোনো ভয়ংকর রোগের বহিঃপ্রকাশ নয়। খুব সাধারণ কিছু চিকিৎসা আর বাড়ির বড় কারো ভরসা দেওয়া— এদিয়েই লাঘব করা সম্ভব। এর মধ্যে কুসংস্কার, সামাজিক বিধিনিষেধ (taboo)-এর কোনো জায়গা নেই। একটু সহানুভূতিশীল ব্যবহার আর সামান্য কিছু ওষুধপত্র খাওয়লেই ভালো ফল পাওয়া যায়।

লেখক পরিচিতি: ডা. কাঞ্চন মুখার্জী, এম বি বি এস, এম আর সি ও জি, ধাত্রীবিদ্যা ও স্ত্রীরোগবিশেষজ্ঞ। প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন।

অ্যানিমিয়া নিয়ে দু-চার কথা

অ্যানিমিয়া তথা রক্তাল্পতার মানে হল রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা কমে যাওয়া, আর হিমোগ্লোবিন আমাদের রক্তের মাধ্যমে দেহের সর্বত্র অক্সিজেন সরবরাহ করার কাজটা করে। রক্তাল্পতাকে তাই উপেক্ষা করলে চলবে না। তবে রক্তাল্পতা তো একটা রোগ নয়, বহু রোগের একটা সাধারণ লক্ষণ হল রক্তাল্পতা। সুতরাং রক্তাল্পতা হলেই বাজার-চলতি আয়রন টনিক খাওয়া ঠিক নয়, একজন চিকিৎসকই কেবল রক্তাল্পতার কারণ বুঝে যথাযথ চিকিৎসা করতে পারেন—লিখছেন **ডা. মৈত্রেয়ী ভট্টাচার্য।**

রক্তাল্পতা শব্দটার চাইতে অ্যানিমিয়া (anemia) কথাটার সঙ্গেই আমরা বেশি পরিচিত। সাধারণভাবে রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা কমে যাওয়াকেই আমরা অ্যানিমিয়া বলি। রক্তে হিমোগ্লোবিন কমে গেছে কিনা বুঝতে হলে প্রথমে জানতে হবে যে আমাদের রক্তে স্বাভাবিক হিমোগ্লোবিনের মাত্রা কত। একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের ক্ষেত্রে প্রতি ১০০ মিলিলিটার রক্তে হিমোগ্লোবিনের স্বাভাবিক মাত্রা ১৩.৫ গ্রাম থেকে ১৫.৫ গ্রাম এবং মহিলার ক্ষেত্রে এই পরিমাণ ১২-১৪ গ্রাম।

হিমোগ্লোবিন কমে কেন?
অর্থাৎ অ্যানিমিয়া কেন হয়?

আমাদের শরীরে রক্ত তৈরি হয় অস্থিমজ্জার (bone marrow) মধ্যে। হিমোগ্লোবিন কমে যাবার কারণগুলো আমরা দুভাগে ভাগ করতে পারি।

১. রক্ত তৈরি কম হচ্ছে।

২. রক্ত তৈরি ঠিক আছে কিন্তু লোহিত রক্ত কণিকা তাড়াতাড়ি ভেঙ্গে যাচ্ছে।

- রক্ত তৈরি কমে যায় সাধারণত হিমোগ্লোবিন তৈরির উপাদান যেমন আয়রন, ভিটামিন বি$_{১২}$ ইত্যাদির অভাবে।
- রক্ত বেশি পরিমাণে ভেঙ্গে যায় সাধারণত: থ্যালাসেমিয়া, G_6PD নামক উৎসেচকের অভাবে, বংশানুক্রমিক স্ফেরোসাইটোসিস ইত্যাদি রোগে। এগুলো সবই বংশগত রোগ। রক্ত ভেঙ্গে যাবার ডাক্তারি ভাষা হল hemolysis (lysis মানে ভেঙ্গে যাওয়া)। যেজন্য এগুলোকে 'হিমোলিটিক ডিজঅর্ডার' বলা হয়।
- এছাড়া কিছু জটিল অসুখের কারণেও রক্ত কমে যেতে পারে, যেমন কিডনির অসুখ, রক্তের ক্যান্সার। এগুলো আমরা এখানে আলোচনা করবো না।

সারা বিশ্বে রক্তাল্পতার অন্যতম কারণ দেহে লোহা তথা আয়রনের ঘাটতি

আয়রনের অভাবে রক্ত তৈরি কমে যায়। তবে আমরা অনেক সময়ই অ্যানিমিয়া মাত্রকেই আয়রন ঘাটতির কারণেই হচ্ছে এমন ধরে ফেলি, সেটা কিন্তু ঠিক নয়।

ভারতবর্ষে রক্তাল্পতার রোগীর সংখ্যা খুব বেশি। প্রধানত মহিলা এবং শিশুরাই এই রোগে ভোগেন। দেখা গেছে ভারতবর্ষে ছয়মাস থেকে পাঁচ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে শতকরা ৭০ ভাগই রক্তাল্পতায় ভোগে। মহিলাদের মধ্যে শতকরা ৫৫ ভাগই এর শিকার। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি আরও খারাপ। শতকরা প্রায় ৭০-৮০ ভাগ শিশু ও শতকরা ৬০ ভাগের ওপর মহিলাই রক্তাল্পতায় ভোগেন।

আমরা অনেক সময়ই মহিলাদের বলতে শুনি— আমার বরাবরই হিমোগ্লোবিন কম থাকে। অর্থাৎ আমরা এটাকে সেরকম গুরুত্ব দিই না। কিন্তু হিমোগ্লোবিন কম থাকার ফলে আপনার জীবনে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। শিশুদের ক্ষেত্রে মানসিক ও শারীরিক বৃদ্ধি ব্যাহত হতে পারে। শিশুদের স্কুলে লেখাপড়ার ফল খারাপ হতে পারে। প্রাপ্তবয়স্ক লোকের কোনো কাজ করার পারদর্শিতা ও ক্ষমতা কমে যেতে পারে। গর্ভবতী মহিলার রক্ত কম থাকলে অনেক সময় প্রাণসংশয় হতে পারে।

আয়রন ঘাটতি জনিত রক্তাল্পতা কেন হয়

১. শিশুদের ক্ষেত্রে সাধারণত সঠিক খাবারের অভাবে। এটা যে সবসময় দারিদ্রের কারণে হয় তা নয়। সঠিক খাবার কোনটা সেটা বোঝার অভাবেও আয়রন ঘাটতি হতে পারে।

২. যদি মা ঘন ঘন গর্ভবতী হন তাহলেও এই ঘাটতি হতে পারে। মায়ের পেটে থাকার সময় শিশুর বৃদ্ধির জন্য আয়রনের প্রয়োজন হয় এবং সেটা মায়ের শরীর থেকেই আসে।

৩. প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের ক্ষেত্রে অর্শের অসুখ থেকে হিমোগ্লোবিন কমতে পারে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এটা আমরা অগ্রাহ্য করি।

৪. গ্রামে বসবাসকারী মানুষের ক্ষেত্রে হুক ওয়ার্ম ক্রিমির সংক্রমণ থেকেও আয়রন ঘাটতি হতে পারে।

কী করে বুঝবেন আপনার হিমোগ্লোবিন কমে যাচ্ছে?

রক্তাল্পতার লক্ষণগুলি সাধারণত non-specific। শরীর দুর্বল লাগা, বেশি ঘুম পাওয়া, খিদে কমে যাওয়া, সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠলে বা বেশি হাঁটাচলা করলে হাঁপিয়ে যাওয়া, বুক ধড়ফড় করা।

শিশুদের ক্ষেত্রে প্রধান উপসর্গ হল— বাচ্চা ঠিকমতো খায় না, খেলাধুলা করে না, বরং কেবল ঝিমিয়ে থাকে। অনেক সময়ে বাচ্চা ঘনঘন সর্দিকাশিতে ভুগতে পারে। রক্তাল্পতার কারণে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যেতে পারে।

এরকম হলে কী করবেন?

রক্ত পরীক্ষা করান। হিমোগ্লোবিন কমে গেছে কিনা দেখুন।

রক্তে হিমোগ্লোবিন যদি কমে গিয়ে থাকে তবে কী করবেন আর কী করবেন না?

প্রথম এবং প্রধান কাজ হল আপনার ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করা।

যেটা করবেন না— সেটা হল নিজে থেকে আয়রন টনিক খেতে শুরু করবেন না। যদিও এদেশে রক্তাল্পতার প্রধান কারণ হল আয়রন ঘাটতি, সব রক্তাল্পতা কিন্তু আয়রন ঘাটতির জন্য হয় না। রক্তাল্পতা হল জ্বরের মতো— অসুখের লক্ষণ মাত্র, এটা কোনো রোগ নয়। জ্বর যেমন ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড, টিবি, ইত্যাদি বিভিন্ন অসুখ থেকে হতে পারে, এবং কী থেকে হচ্ছে দেখে নিয়ে চিকিৎসা করতে হয়— রক্তাল্পতাও তাই।

যদি ডাক্তারবাবু পরীক্ষা করে দেখেন আয়রন কমে যাবার জন্য রক্তাল্পতা হয়েছে তবেই আয়রন খান।

আয়রন ঘাটতির জন্য রক্তাল্পতা হলে কী করবেন?

আয়রন ট্যাবলেট বাজারে অন্তত ১০০ থেকে ১৫০ রকমের পাওয়া যায়। ডাক্তারি শাস্ত্র অনুযায়ী ফেরাস সালফেট ($FeSO_4$) এবং ফেরাস ফিউমারেট খাবার পক্ষে সব থেকে ভালো আয়রন যৌগ। বাজার চলতি বিভিন্ন দামি আয়রন ঘটিত ওষুধ পাওয়া যায়। যেগুলো শুধু চিকিৎসার খরচ বাড়ায়, উপকার বেশি হয় না। সুতরাং বাজারে সব থেকে কমদামি যে আয়রন ট্যাবলেট পাবেন সেটাই যথেষ্ট ভালো।

বেশিরভাগ সময়েই দেখা যায় আয়রন খেয়ে হিমোগ্লোবিন বেড়ে যায় কিন্তু দুদিন বাদে আবার কমে যায়— এটা কেন হয়?

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রোগীরা যেটা করেন তা হল আয়রন খেয়ে হিমগ্লোবিন বেড়ে গেলেই আয়রন বন্ধ করে দেন। কারণ ততদিনে রোগীর সব উপসর্গ কমে গেছে। ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ বন্ধ করবেন না।

কী ধরণের খাবার খেলে শরীরে আয়রনের পরিমাণ বাড়তে পারে?

আমরা সবাই যেগুলো জানি সেগুলো হল— থোড় , মোচা, কাঁচকলা। এছাড়াও মুসুরডাল, লাউ,

সবুজ শাকপাতা— এগুলোতেও প্রচুর আয়রন থাকে। বাদাম, খেজুর বেদানাও আয়রন সমৃদ্ধ। কুলেখাড়া পাতাতেও প্রচুর আয়রন থাকে। আবার কিছু খাবার আছে যার মধ্যে আয়রন থাকে না কিন্তু সেগুলো অন্যান্য খাবার থেকে শরীরে আয়রন শোষণ হওয়াকে বাড়িয়ে দেয়, যেমন পেয়ারা। দেখা গেছে যে রোজ একটা করে পেয়ারা খেলে হিমগ্লোবিন ১-২ গ্রাম (প্রতি ১০০ মিলিলিটার রক্তে) বাড়ে।

অতঃ কিম?

এসব কিছুর পরেও যে কাজটা বাকি থেকে যায় সেটা হল যে কারণে আয়রন ঘাটতি হয়েছে সেটার চিকিৎসা করানো। অর্থাৎ অর্শ থাকলে সেটাকে সারান। বেশি ঋতুস্রাব হলে স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

কারণের চিকিৎসা না করলে কী হবে?

ছোটবেলায় করা চৌবাচ্চা ও আর তার দুটো নলের কথা মনে আছে? চৌবাচ্চার নিচের জল খালি করার নলটা যদি খোলা থাকে তাহলে উপরের জল ভরার নল বন্ধ করলেই (পড়ুন আয়রন খাওয়া বন্ধ করলে) চৌবাচ্চা আবার ধীরে ধীরে খালি হয়ে যাবে— হিমোগ্লোবিন আবার কমে যাবে।

- রক্তে অক্সিজেন-পরিবহনকারী অণু হিমোগ্লোবিনের অভাবকে বলে অ্যানিমিয়া বা রক্তাল্পতা।
- রক্তাল্পতা কোনো নির্দিষ্ট রোগ নয়, রোগের লক্ষণ মাত্র।
- আমাদের দেশে আয়রনের ঘাটতি অ্যানিমিয়ার প্রধান কারণ। অনেক কারণে আয়রন ঘাটতি হয়।
- রক্তাল্পতা হয়েছে বলেই নিজে থেকে আয়রন টনিক খাবেন না— উল্টে বিপদ হতে পারে। ডাক্তার দেখান।

লেখক পরিচিতি ঃ ডা. মৈত্রেয়ী ভট্টাচার্য, এম বি বি এস, এম ডি, ডি এম, একজন হিমাটোলজিস্ট। বর্তমানে কলকাতার একটি সরকারি মেডিকেল কলেজে হিমাটোলজি বিভাগের অধ্যাপক।

উৎস মানুষ
বিজ্ঞান, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান :
বই-চিত্র (কফি হাউসের তিনতলা), পাতিরাম, বুক মার্ক, অমর কোলে (বিবাদি বাগ), দিলীপ মজুমদার (ডেকার্স লেন), সুনীল কর (উল্টোডাঙা), কল্যাণ ঘোষ (রাসবিহারী মোড়), র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন (বেনিয়াটোলা লেন, কলেজ স্ট্রিট), ডি আর সি এস সি ঢাকুরিয়া অফিস (দক্ষিণাপণ- এর উল্টোদিকে)। অম্লান দত্ত বুকস্টোর, বিধাননগর পৌরসভা— এফ ডি ৪১৫/এ। দে বুক স্টোর, কলেজ স্ট্রিট।
যোগাযোগ : ই-মেল- utsamanush1980@gmail.com
ফোন- ৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৯৪৩৩৮৮৮৮৬২/৯৮৩১৪৬১৪৫৬

পরীক্ষার তাৎপর্য ও তাৎপর্যের পরীক্ষা

রক্তপরীক্ষার ওপর সাধারণ মানুষ বড় বেশি গুরুত্ব দেন, যেন এটা এমন এক ম্যাজিক যা দিয়ে রোগীর সব খবর পাওয়া যাবে। অন্যান্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা এমনকি চিকিৎসকের ক্ষমতার দৌড় নিয়েও মানুষের অবাস্তব প্রত্যাশা রয়েছে। ধারণাগুলির সত্যাসত্য বিচারের চেষ্টা করছেন **ডা. জয়ন্ত দাস**।

প্রথমেই বলে রাখি ডাক্তারেরা যখন লেখেন তখন নানা কারণে রোগীর নাম-ধাম বদলে কাল্পনিক নামের আশ্রয় নিতে হয়। কিন্তু আমার আজকের লেখার প্রতিটি চরিত্র বাস্তব, এবং একটি নামও কাল্পনিক নয়।

অনিমেষ সেন আমার অনেক দিনের রোগী। সেদিন রক্তপরীক্ষার রিপোর্ট নিয়ে এসেছেন। সেটা দেখে ওষুধ লিখছি, অনিমেষবাবু জিজ্ঞেস করলেন, ''কী বুঝলেন রোগটা?''

আমি কিঞ্চিত অবাক হই। এ রোগ নিয়ে অনিমেষবাবুর সঙ্গে আমার বহুদিন কথা হয়ে গেছে, হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন? ''পুরোনো সোরিয়াসিস, নতুন আর কি বুঝব?'' আমি বলি।

''তাহলেও, রক্তপরীক্ষা করালেন তো, তাই বলছি কী পেলেন?''

রক্তপরীক্ষা করার আগে অনিমেষবাবুর সঙ্গে আলোচনা হয়েছিল। সোরিয়াসিস। রোগটি খুব দীর্ঘস্থায়ী একটি চর্মরোগ। অনিমেষবাবুর রোগ মলম লাগিয়েই প্রথমদিকে বছর চারেক মোটামুটি আয়ত্বে ছিল। কিন্তু এখন ক'দিন বেশ দ্রুত বাড়ছে। সুতরাং মুখে খাবার ওষুধ দিতে হবে। যে ওষুধটি দিতে চাইছি, সেটি দিলে কোনো কোনো রোগীর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। সেই পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া ঠেকানোর জন্য প্রথমেই নিয়মমাফিক কিছু পরীক্ষা করে নিতে হয়। সাধারণ, চেনা পরীক্ষা সব। রক্তের টি সি, ডি সি, প্লেটলেট কাউন্ট, লিভারের এনজাইম-এর মাত্রা, ইত্যাদি। অনিমেষবাবুকে জানিয়েছিলাম, নতুন যে ওষুধটি দিতে চাইছি, সেটা দেওয়া যাবে কিনা তা জানার জন্যই রক্তপরীক্ষা। কিন্তু পরীক্ষার রিপোর্ট হাতে নিয়ে তিনি ভাবছেন, রক্ত পরীক্ষা যখন, তখন নিশ্চয়ই তাঁর পুরোনো রোগ নিয়ে কিছু-না কিছু জানা গেছে।

মজার কথা হল অনিমেষবাবু হাইস্কুলে পড়ান, আর তাঁর পড়ানোর বিষয় জীবন বিজ্ঞান। রক্তের টি সি, ডি সি, প্লেটলেট কাউন্ট, লিভারের এনজাইমের মাত্রা— এসবের তাৎপর্য তিনি ছাত্রদের পড়ান। তবু, তবুও তাঁর মনের অগোচরে অবচেতনে এ ধারণা রয়ে গেছে যে রক্তের পরীক্ষা মানেই শরীরের ভেতরের সবকিছু দেখে ফেলা।

মনে পড়ে আমার আর এক রোগী, প্রতিমা বাগ, বয়স পঞ্চান্ন, সাকিন নসরতপুর, জিলা

> লেখার প্রতিটি চরিত্র বাস্তব, এবং একটি নামও কাল্পনিক নয়

বর্ধমান, সর্বশিক্ষা অভিযানে খাতায় কলমে সাক্ষর কিন্তু পড়তে জানেন না, তাঁর কথা। ''বাবা ডাক্তার, তুমি একবার মোর অক্তটি পরিকখে করে দেখ দিনি, তিন মাস চুলকুনির জ্বালায় ঘুমুতে পারিনে, কিসে মোরে চুলকোয়?'' তাঁর হয়েছিল খোস, চোখে দেখেই দিব্যি ধরা যাচ্ছিল, রক্তপরীক্ষায় খোস মোটেও ধরা পড়ে না। কিন্তু তিনি অক্তটি পরিকখে না করে ওষুধ খাবেন না

ধনুর্ভঙ্গ পণ করেছিলেন, সুতরাং রক্ত পরীক্ষা করতে দিলাম সুগার আছে কিনা জানতে। তারপর ওষুধ লাগিয়ে চুলকানি সেরে যেতে তাঁর বোধকরি রক্তপরীক্ষার ওপর শ্রদ্ধা চারগুণ বেড়ে গেল, কিন্তু করিই বা কি!

প্রসঙ্গত বলে রাখি, একটা বয়সের পর রক্তের সুগার পরীক্ষা কিন্তু সবারই করানো প্রয়োজন। এরকম আরও কিছু পরীক্ষা আছে যেগুলো করানো দরকার; এবং সুগার পরীক্ষার মতো কিছু পরীক্ষা আছে যেখানে রোগীর বিভিন্ন রোগ-উপসর্গের চাইতে একটি টেস্টের সঠিক রিপোর্ট বেশি মূল্যবান হতে পারে। কিন্তু বর্তমান নিবন্ধে আমি বিষয়টির উল্টোদিকটা বেশি করে দেখতে চাইব, দেখতে চাইব যে রিপোর্টকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়াটাও একটি ব্যাধি, ঠিক যেমন একটি ব্যাধি হল প্রয়োজন হলেও টেস্ট না করানো, বা তার রিপোর্টকে অগ্রাহ্য করা।

তখন আমি মেডিকেল কলেজে ইন্টার্ন। অরুণাংশু আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। শিবপুর বি ই কলেজ থেকে মেটালার্জি ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পাস করে সদ্য চাকরি পেয়েছে, আমাকে ধরে বসল, তার সমস্ত কিছু পরীক্ষা করে দেখে দিতে হবে— মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত। তখনও সি টি স্ক্যান, এম আর আই— এসব ছিল না। সুতরাং আমি বুঝিয়ে বললাম, এক্স-রে আর আল্ট্রাসোনোগ্রাম করে যা দেখা যায় তা মোটেই 'সবকিছু' নয়, আর কোনো ডাক্তার দেখে ওগুলো করবার পরামর্শ দিলে তবেই ওসব পরীক্ষা করিয়ে লাভ আছে। অরুণাংশু বুঝল, তারপর বলল, ''তাহলে তুই অন্তত সব রক্ত পরীক্ষাগুলো করিয়ে দে।'' বোঝো ফ্যাচাং!

আমি খুব সিরিয়াস মুখ করে বললাম, ''ঠিক আছে, কিন্তু আমায় পরে দোষ দিস না।''

অরুণাংশু অবাক, ''আরে তোকে কেন হঠাৎ দোষ দিতে যাবো?''

আমি বলি, ''আর বলিস না, তোর 'সব রক্তপরীক্ষা' করাতে গেলে ভি ডি আর এল করাতে হবে। তাতে যদি পজিটিভ আসে?'' পাঠককে জানিয়ে রাখি 'ভি ডি আর এল' হল খুব চালু একটা রক্তপরীক্ষা। 'ভি ডি' কথাটি পুরো বললে হয় 'ভেনেরিয়াল ডিজিজ'। ইংরেজিতে এই কথাটির মানে হল যৌনরোগ। তাই পরীক্ষাটির এমনতর নামের জন্য অনেকে ভাবেন এতে বুঝি যে কোনো যৌন ব্যাধিই, বা যে কোনো ভি ডি-ই

ধরা পড়ে; সেটা ভুল ধারণা। এটা সিফিলিস নামক যৌনরোগ ধরার একটা পরীক্ষা। আগে সিফিলিসের অন্য পরীক্ষা করার তেমন সুযোগ কলকাতায় ছিল না, তখন এ-পরীক্ষাটিই একমাত্র ভরসা ছিল। এখনও বিভিন্ন ক্ষেত্রে 'ভি ডি আর এল' বেশ কাজের পরীক্ষা, কিন্তু এই পরীক্ষায় পজিটিভ ফল হলে রোগীর সিফিলিস হয়েছে এমনটা জোর করে বলা যায় না, যদিও সাধারণ মানুষের, এমনকি অনেক ডাক্তারের, সেই রকমই ধারণা। এখন আমরা জানি ভি ডি আর এল তেমন নির্ভরযোগ্য পরীক্ষা নয়, এতে প্রায়ই ভুলভাবে পজিটিভ আসে, অর্থাৎ সিফিলিস না থাকলেও এ-পরীক্ষায় পজিটিভ এসে যেতে পারে।

অরুণাংশু ভারি মর্মাহত হয়— ''ভি ডি আর এল করে আমার পজিটিভ আসবে, তুই আমার বন্ধু হয়ে এমন ভাবলি কী করে?''

আমি মুচকি হাসি। ''এসেও তো যেতে পারে। আর আমি না হয় মেনে নেব অরুণাংশু আমার বন্ধু, আমি জানি সে হিরের টুকরো ছেলে, ভি ডি আর এল ভুল ভাবে পজিটিভ হয়েছে। ওরকম হয়েই থাকে। কিন্তু আর যারা রিপোর্টটা দেখবে তারা কী ভাববে বলত?''

অরুণাংশু খানিক দোনামনা করে, তারপর মেনে নেয় নাঃ, ওরকম অকারণে লিস্টি মিলিয়ে রক্তপরীক্ষা করাটা তেমন ভালো আইডিয়া নয়। শেষে ঝাল ঝাড়ে আমার ওপর। ''কিছু মনে করিস না, তোরা ডাক্তাররা কিন্তু অতি অপদার্থ। কী সব টেস্ট বার করেছিস, শুধু-মুদু পয়সা খরচ। টেস্ট করে যদি বলতেই না পারিস রোগ আছে কি নেই তাহলে ফেলে দে তোদের ওই যন্ত্রপাতি আর ল্যাবরেটরিগুলো। আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ওইসব ব্যাপার নেই। মাপব, বলে দেব কোথায় কী করতে হবে, কোথায় কী ডিফেক্ট। কেন যে মরতে ডাক্তারি পড়তে গেলি।''

অরুণাংশুর সঙ্গে যোগ ছিল বহু বছর, কিন্তু কালের নিয়মেই বোধকরি আস্তে আস্তে ক্ষীণ হয়ে আসছিল যোগসূত্র সব। বছর দশেক পরে অরুণাংশুর সঙ্গে একদিন দেখা বি ই কলেজের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং-এর সামনে, বহুদিন পরে নিজের পুরোনো ডিপার্টমেন্টে একটু ঘুরতে এসেছে। টাটানগরে থাকে, টিসকো-তে চাকরি করে, কোয়ালিটি কন্ট্রোলে আছে। বড় বড় যন্ত্র নিয়ে দেখে মাল কি বেরোল, কেমন বেরল। ওর সঙ্গে কথা হল, কেমন করে কোথায় কোথায় ও ট্রেনিং দেয়, ট্রেনিং নেয়। যে যন্ত্রটা ও এখন চালাচ্ছে সেটা নাকি সারা ভারতে আর একটাই মাত্র আছে। প্রতিদিন নতুন নতুন যন্ত্র বেরোচ্ছে, নতুন ট্রেনিং, প্রোডাক্টে ডিফেক্ট আরও সহজে ধরা যাচ্ছে। তবু, এত কিছু উন্নতি সত্ত্বেও, কিছু ডিফেক্ট কেমন করে ধরা না পড়ে বেরিয়ে যায়! ফলে আরও নতুন আরও দামি যন্ত্র— এ যেন এক প্রযুক্তির রেস, ঘোড়দৌড়। এরকম বহু কথার পর আবার আমরা দুজনে যে যার গন্তব্যে।

যেতে যেতে মনে হল, আরে অরুণাংশুকে তো ফিরিয়ে দেওয়া যেত ওর সেই গালিগুলো, বলে দেওয়া যেত— ''টেস্ট করে যদি বলতেই না পারিস রোগ আছে কি নেই তাহলে ফেলে দে তোদের ওই যন্ত্রপাতি আর ল্যাবরেটরিগুলো''।

ভি ডি আর এল-এর কথায় অন্য এক কথা মনে পড়ে গেল। আমার কাছে অনেকে আসেন যাঁদের রক্তপরীক্ষা করে ভি ডি আর এল পজিটিভ পাওয়া গেছে, এবং সেজন্য তাঁদের ভিসা আটকে আছে। গালফ কান্ট্রি, চলতি কথায় আরব দুনিয়ার নানা বড়লোক দেশগুলিতে আমাদের দেশ থেকে বহু মানুষ যান দু'পয়সা রোজগারের আশায়। আর ওইসব দেশে ভিসার ভারি কড়াকড়ি। ভি ডি আর এল পরীক্ষায় যদি পজিটিভ বেরোয় তো ব্যস, তোমার ভিসা হবার কোনো চান্সই নেই। আবার অনেকে আসেন যাঁরা মিলিটারি কি বিএসএফ-এর চাকরি পরীক্ষায় এমনিতে পাস করে গেছেন কিন্তু ভি ডি আর এল পজিটিভ থাকায় মেডিকেল টেস্টে বাতিল হয়েছেন। কি রকম অদ্ভুত পরিস্থিতি দেখুন। ভি ডি আর এল পজিটিভ মানেই সেই মানুষটির সিফিলিস হয়েছে এমন নয়, বহু ক্ষেত্রেই আমরা যাকে বলি 'ফলস পজিটিভ', তেমনটি হতে

> টেস্ট করে যদি বলতেই না পারিস রোগ আছে কি নেই তাহলে ফেলে দে তোদের ওই যন্ত্রপাতি আর ল্যাবরেটরিগুলো।

পারে। আবার কারও যদি জীবনে একবার কখনো সিফিলিস হয়ে থাকে তো তাঁর সারা জীবন ধরে ভি ডি আর এল পজিটিভ থেকে যাবার সম্ভাবনা আছে। শুধু ভি ডি আর এল নয়, সিফিলিসের অন্য অনেক পরীক্ষাই এরকম পজিটিভ থেকে যায়।

এসব কথা আরবের ভিসা যাঁরা দেন তাঁদের চিকিৎসকেরা যে জানেন না তা নয়। মিলিটারি বা বিএসএফ— এসবে ডাক্তার হিসেবে কাজ করেন এমন অনেক বন্ধু আমার আছেন, তাঁরা তো এক বাক্যে মেনে নেন ভি ডি আর এল পজিটিভ দেখে চাকুরিপ্রার্থীকে বাতিল করা অতীব অজ্ঞতার কাজ। কিন্তু যেকোনো কারণেই হোক প্রথাটা চলে আসছে। কারণগুলোর সবগুলো নিয়ে আলোচনা বর্তমান নিবন্ধের আওতার বাইরে। যেমন একটা

> পরীক্ষা-নিরীক্ষার তাৎপর্য নিয়েই আমাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতি তৈরি হয়নি

কারণ হল যৌনরোগীর প্রতি সমাজে নীতিবাগীশ উন্নাসিক ঘৃণা, যা আসলে নিজেকে উচ্চতর জীব হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার এক কায়দাবিশেষ। এটা নিয়ে কিছু বলা আমি আজকের মতো মুলতুবি রাখব।

আজকের নিবন্ধের জন্য জরুরি কথাটা হল, রক্তপরীক্ষা করে তার ফলাফল থেকে যতটা নিশ্চিতভাবে রোগ নির্ণয় করা যায়, আমাদের সমাজ রক্তপরীক্ষাকে তার চাইতে ঢের উঁচু আসনে বসিয়ে দিয়েছে। এবং যেখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে অফিসিয়াল দলিলে লিখিত হচ্ছে রোগ আছে কি নেই, সেখানে ডাক্তারের ব্যক্তিগত মতামত দেবার চাইতে পরীক্ষার রিপোর্ট টুকে দেওয়াটা ভিসা কর্তৃপক্ষ বা মিলিটারি কর্তৃপক্ষ বেশি নিরাপদ বলে মনে করছেন, যদিও ডাক্তারের সুচিন্তিত মতটি পরীক্ষার রিপোর্ট-এর চাইতে ঢের বেশি সঠিক।

ভি ডি আর এল নিয়ে এত কথা বলা হল দেখে কেউ হয়ত বা মনে করতে পারেন যে কেবল ভি ডি আর এল নিয়েই যত গন্ডগোল, আর কোনো পরীক্ষা নিয়ে সমস্যা নেই। কিন্তু তা নয়, ভি ডি আর এল একটা উদাহরণ যেটা বহুল প্রচলিত, এবং যেটার তাৎপর্য নিয়ে যেমন সাধারণ মানুষের মধ্যে ভুল ধারণা রয়েছে, তেমনই ভুল ধারণা রয়েছে ডাক্তারের মনে, এবং মিলিটারি-ভিসা অফিস ইত্যাদি জায়গায় যাঁরা নীতি নির্ধারণ করেন তাঁদের মনেও। ভি ডি আর এল ছাড়াও অনেক পরীক্ষা রয়েছে যাদের গুরুত্ব নিয়ে লোকের ধারণা ভুল। বস্তুত, পরীক্ষা-নিরীক্ষার তাৎপর্য নিয়েই আমাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতি তৈরি হয়নি।

শুধু রক্তপরীক্ষা বা যাবতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষাই

নয়, মেডিসিন-বিষয়টি সামগ্রিকভাবে এই মানসিকতার শিকার। চিকিৎসাবিদ্যা ব্যাপারটাই সুনিশ্চিত নয়, তার মধ্যে আইনশাস্ত্রী যেমন 'সর্ব সন্দেহের উর্দ্ধে প্রমাণ' খোঁজেন, সেরকম প্রমাণ সবসময়ে মেলে না। কিন্তু আমদের সমাজ রক্তপরীক্ষাকে যেমন তার প্রাপ্য আসনের চাইতে ঢের বেশি নিশ্চয়তার উচ্চাসনে বসিয়েছে, তেমনই চিকিৎসা-ব্যাপারটিকেই তার ক্ষমতার চাইতে বেশি সুনিশ্চিত বলে ধরে নিয়েছে। এবং চিকিৎসাবিদ্যার অন্তর্লীন অনিশ্চয়তাকে চিকিৎ-সকেরাও বোধকরি জোরগলায় প্রচার করতে কিন্তু-কিন্তু করেন— যে সংস্কৃতিতে দৈব ওষুধ

সুনিশ্চিত সাফল্য জাহির করার প্রবণতা 'চিকিৎসবিদ্যার মহান অন্তর্লীন অনিশ্চয়তা' নিয়ে কথা বলার চাইতে বেশি আপাতদৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

থেকে বিকল্প মেডিসিন (আয়ুর্বেদ-যোগ-ইউনানি-সিদ্ধা-হোমিওপ্যাথি ইত্যাদি) সব অসুখ সারিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়, এবং তা অনেকসময় দেয় সরকারি দাক্ষিণ্যে[১] সেখানে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা যাঁরা দেন তাঁরাও পড়েন দোটানায়।

এর ওপরে রয়েছে নানা ওষুধ-কোম্পানি, বড় ডায়াগনোস্টিক সেন্টার ইত্যাদির অবিরত প্রচার, যেটা এদেশে অন্তত একেবারে অনিয়ন্ত্রিত। ফলে নিজের ঢাক নিজে পেটানোর প্রবণতা থেকে ডাক্তারের মুক্তি পাওয়া শক্ত। বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতার ফলে সত্য-মিথ্যা গৌণ হয়ে পড়ে, বৈজ্ঞানিক চিকিৎসাকেও 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজ' করে অর্ধ-সত্যের আশ্রয় নিতে হয়। 'আমরা পারি, আমরাই কেবল পারি' জাতীয় প্রচারে মেতে উঠবার প্রবণতা 'চিকিৎসাবিদ্যার মহান অন্তর্লীন অনিশ্চয়তা' নিয়ে কথা বলার চাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়।

পাদটিকা

১. "Homoeopathy today... (in) India... has become a household name due to the safety of its pills and gentleness of its cure"— এটি সরকারি দপ্তর AYUSH-এর official website থেকে নেওয়া। এতে হোমিওপ্যাথির কার্যকারিতা ও নিরাপত্তাকে একেবারে ঢালাও স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তার সারবত্তা নিয়ে আপাতত প্রশ্ন তুলছি না। খালি এটুকুই বলছি, বিভিন্ন চিকিৎসা পদ্ধতির মধ্যে একটিকেও যদি পুরো নিরাপদ ও কার্যকরী বলে দরাজ সার্টিফিকেট দেওয়া হয় তবে তার প্রতিদ্বন্দ্বী চিকিৎসাপদ্ধতিগুলির অভ্যন্তরেও চাপ তৈরি হয়। চাপ তৈরি হয় যে নিজের অসুবিধের কথা নিজের সীমাবদ্ধতার কথা পাবলিকের কাছে স্বীকার না করাই ভালো। চোখ বুজে বিনা-প্রশ্নে নিজের চিকিৎসা পদ্ধতির প্রতি অতি-আনুগত্যের ব্যাধি সর্বব্যাপী হয়ে পড়ে। আধুনিক চিকিৎসার (বা পুরো বিজ্ঞানেরই) ভিত্তিভূমি হল চলে আসা ধারণাগুলিকে বিনা প্রশ্নে মেনে না নেওয়া, (নিজের) বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতাকে উন্মোচন করা, তারপর সেই সীমাবদ্ধতাকে কাটানোর চেষ্টা করা। এটা দুঃখজনক হলেও সত্য যে এদেশে বিভিন্ন চিকিৎসাপদ্ধতির বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা বৈজ্ঞানিক চিকিৎসাপদ্ধতির আভ্যন্তরীণ আত্মসমালোচনার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

লেখক পরিচিতি ঃ ডা. জয়ন্ত দাস, এম বি বি এস, এম ডি, ত্বকরোগ বিশেষজ্ঞ। কলকাতার একটি বেসরকারি পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট মেডিকেল ইনস্টিটিউটে সহযোগী অধ্যাপক।

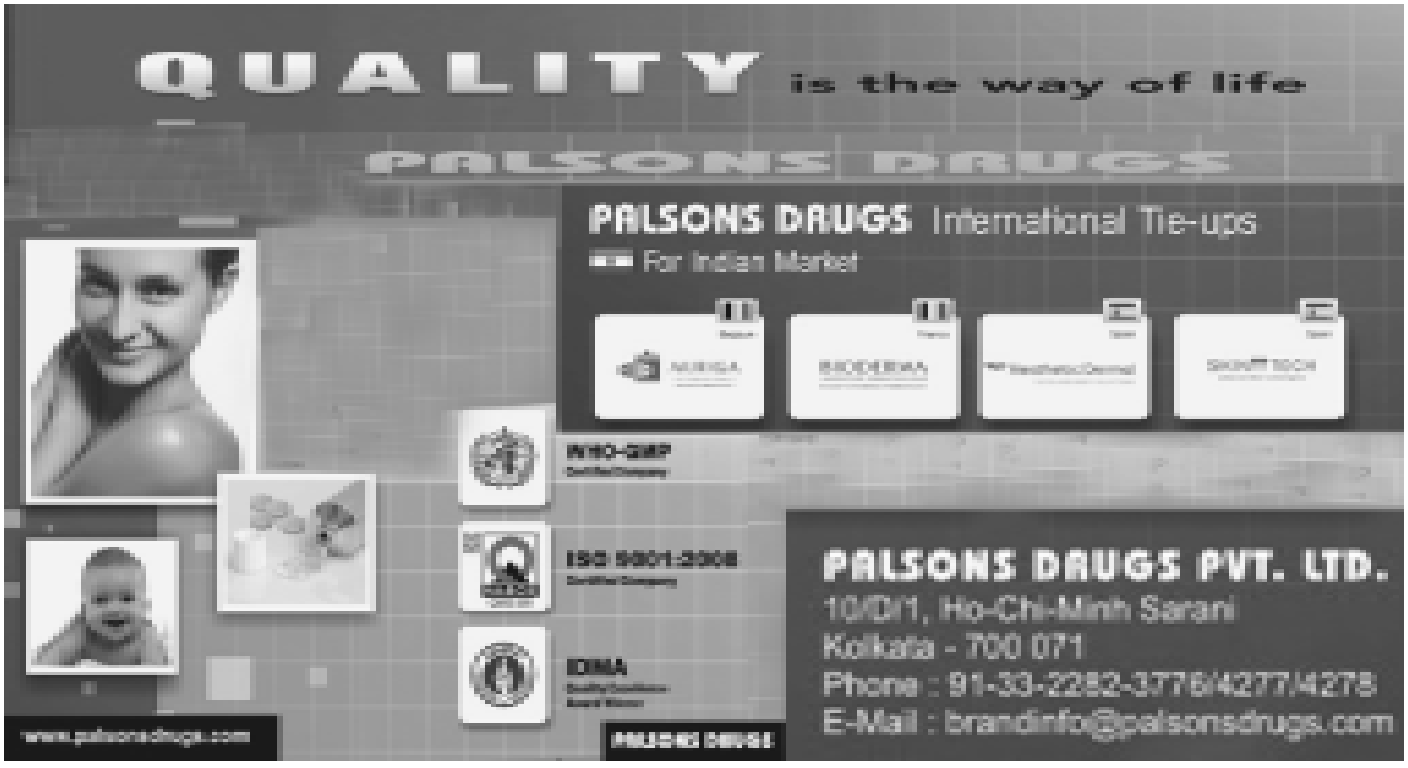

গ্লুকোজ-খেকো কোষের সন্ধানে পেট-স্ক্যান

পেট-স্ক্যান বলতে যদি এখনও ভাবেন আপনার পেট-টা যন্ত্র দিয়ে দেখা হবে তবে আপনি মান্ধাতার ভাই-বেরাদরের যুগে পড়ে আছেন। আধুনিক মেডিসিনের যেসব তাজ্জব যন্ত্র বেরিয়েছে PET-স্ক্যান হল তাদেরই এক বিশিষ্ট সদস্য। তবে জায়গা বুঝে ব্যবহার করতে জানা চাই— লিখছেন **ডা. সুস্মিতা ঘোষাল**।

ক বাবুর গলায় একটা মটর দানার মতো আব গজিয়েছে। পরীক্ষা করে জানা গেছে যে শরীরের কোনো এক অংশ থেকে ক্যান্সারের কোষ এখানে বাসা বেঁধেছে। কোথা থেকে সেটা এসেছে সেটা জানতে ডাক্তারবাবু ঢের পরীক্ষা করলেন, সম্ভব-অসম্ভব সব ছিদ্রে নল ঢোকালেন, শেষে হার মেনে বললেন পেট-স্ক্যান করতে হবে। আর তাতেই চিচিংফাঁক— ফুসফুসের মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকা ক্যান্সার ধরা পড়ল। এই ম্যাজিক দেখে প্রতিবেশী গ বাবু বায়না ধরেছেন যে তিনিও পেট-স্ক্যান করাবেন, তাঁর দেহেও নাকি ক্যান্সার লুকিয়ে আছে। আব্দার জানিয়েছেন আমার কাছে, সরকারি দরে এই কাজটি করিয়ে দিতে হবে। অগত্যা নিয়ে গেলাম ডা. অনীশ ভট্টাচার্যের কাছে, উনি আমাদের ইনস্টিটিউটে নিউক্লিয়ার মেডিসিনের অধ্যাপক। প্রথমেই প্রশ্ন করি, আপাতদৃষ্টিতে সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষের এই স্ক্যান করলে ক্যান্সার ধরা পড়বে কি? ডা. ভট্টাচার্য যা জানালেন তা দেশের সব গ বাবুদের জন্য এই পত্রিকায় জানাচ্ছি।

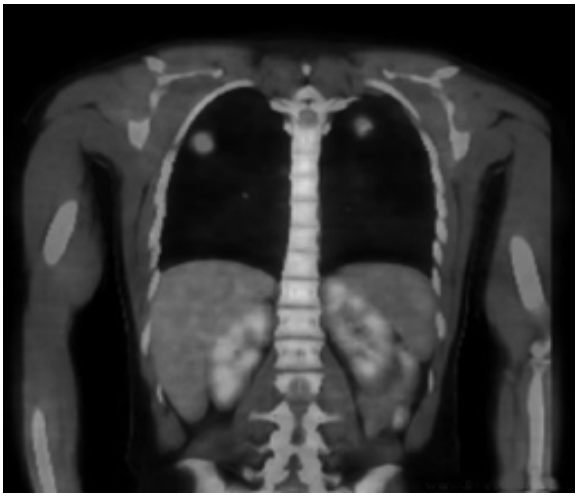

অধ্যাপক ভট্টাচার্য : ক্যান্সার তো নানা রকমের হয়, তাদের স্বভাবও বিচিত্র, কাজেই এই স্ক্যান সব ধরনের ক্যান্সার খুঁজে বার করতে পারবে না। আবার এতে যা-ই ধরা পড়বে তা-ই ক্যান্সার সেটাও বলা যাবে না। কাজেই যাবতীয় ক্যান্সার স্ক্রীনিং-এর জন্য পেট (PET- Positron Emission Tomography) স্ক্যান মোটেই আদর্শ পদ্ধতি নয়।

প্রশ্ন : আর একটু বুঝিয়ে বলবেন?

উত্তর : প্রথমে বলি পেট-স্ক্যান কী করে কাজ করে। গ্লুকোজ শরীরের কোষগুলিকে এনার্জি যোগায়। যে কোষের ভিতর বেশি রাসায়নিক প্রক্রিয়া চলছে, সেই কোষ অন্যদের চেয়ে বেশি গ্লুকোজ সংগ্রহ করবে। এই গ্লুকোজের সাথে কোনো তেজস্ক্রিয় পদার্থ থাকলে কোষ থেকে যে রশ্মি বেরোবে তা স্ক্যান করলে বোঝা যাবে কোন কোন কোষ আপেক্ষিকভাবে বেশি গ্লুকোজ ব্যবহার করছে। এই ভাবে অস্বাভাবিক কোষ চেনা যায়। Fluorine-18 একটি positron emitting isotope—তাকে গ্লুকোজের সাথে জুড়ে দিলে হয় তেজস্ক্রিয় এফ ডি জি (FDG)। এই এফ ডি জি ইঞ্জেকশান দিয়ে শরীরে ঢুকিয়ে তারপর সমস্ত দেহের স্ক্যান করলে যে অংশে বেশি তেজস্ক্রিয়তা দেখা যাবে (হট স্পট), সেখানেই গন্ডগোল।

প্রঃ মানে ক্যান্সার?

উঃ ক্যান্সার হতে পারে, আবার কোনো জীবাণু সংক্রমণও হতে পারে। আমাদের দেশে অনেকের মধ্যে টিবি রোগের বীজাণু লুকিয়ে আছে, সেই অংশতেও হটস্পট দেখা যেতে পারে। যে রোগে শরীরের রোগাক্রান্ত কোষে বেশি মাত্রায় গ্লুকোজের প্রয়োজন হয় সেই রোগ এই স্ক্যানে ধরা পড়ে।

প্রঃ শুধুই কি গ্লুকোজ ব্যবহার করা হয়?

উঃ সাধারণত তাই হয়, তবে বিশেষ ক্ষেত্রে অন্য রাসায়নিক ব্যবহার করা যায়। যেমন হাড়ের জন্য F-18 Fluoride, আবার Ga-68 DOTATATE & F-DOPA এক বিশেষ ধরনের (Neuro-endocrine) টিউমার চিহ্নিত করে। যাই ব্যবহার করা হোক, টিউমার চিহ্নিত করা গেলে ঠিক সেইখান থেকে বায়োপ্সি নিলে সঠিক প্রমাণ পাওয়া যাবে। বর্তমানে আরও অনেক দ্রব্য নিয়ে গবেষণা চলছে। হয়তো কোনোদিন এমন হবে যে পেট স্ক্যানে ব্যবহৃত বস্তু টিউমারের গঠন ও প্রকৃতি জানাবে। আর একই পন্থায় তেজস্ক্রিয় পদার্থ ক্যান্সার কোষে ঢুকে সেই কোষকে নাশ করবে (targeted therapy)।

প্রঃ তাহলে ক্যান্সারে এর কী উপকার?

উঃ রোগ শরীরে কতটা ছড়িয়েছে তা খুব তাড়াতাড়ি জানা যায়। ক্যান্সার আক্রান্ত প্রত্যঙ্গে বিকৃতি দেখা যায় এক্স-রে বা সিটি স্ক্যানে। কিন্তু বিকৃতি আসে তো পরে, তখন রোগ খানিকটা এগিয়ে গেছে। এর অনেক আগেই, শুধু হট স্পট দেখে বোঝা যায় কোন কোন অংশে রোগের ছোঁয়া লেগেছে। ইদানিং পেট ও সিটি স্ক্যান একত্রে করা হয় যাতে দৈহিক বিকৃতি (সিটি স্ক্যান করে) ও রাসায়নিক বিকৃতি (পেট স্ক্যান করে) একসাথে ধরা পড়ে। আবার, চিকিৎসায় উপকার হচ্ছে কিনা, চিকিৎসা শেষে দেহে কোনো ক্যান্সার কোষ অবশিষ্ট রইল কিনা, এর জবাবও দেবে পেট স্ক্যান। লিমফোমা, ফুসফুস, স্তন আর অন্ত্রের ক্যান্সারে এখন নিয়মিত ভাবে এই পরীক্ষা করানো

হচ্ছে। আবার রেডিয়েশন দেবার সময় টিউমারের সঠিক মাপ জেনে নিতে সাহায্য করে পেট স্ক্যান।

প্রঃ আর কোন রোগে পেট স্ক্যান করানো হয়?

উঃ আগেই বলেছি যে সংক্রমণ ধরায় এর উপযোগিতা আছে। হয়তো কেউ অনেকদিন ধরে জ্বরে ভুগছেন, ইনফেকশানটা ঠিক কোথায় খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না— সেক্ষেত্রে পেট স্ক্যান দেখিয়ে দেবে কোথায় সমস্যা। হার্ট-অ্যাটাকের পরে হৃদপেশি কোথায় কতটা জখম হয়েছে তা নির্ভুল ভাবে বলে দেবে পেট। এমনকি মস্তিষ্কের গ্লুকোজ ব্যবহার দেখে বলা যায় মানসিক ব্যাধির সূত্রপাত হয়েছে কিনা।

প্রঃ আপনি বলছেন পেট স্ক্যান করাতে তেজষ্ক্রিয় গ্লুকোজ লাগে। এই বিশেষ তেজষ্ক্রিয় গ্লুকোজ কোথায় পাব?

উঃ বাজারে পাবেন না। সাইক্লোট্রন (cyclotron) দ্বারা প্রস্তুত এই বস্তুটি দু'ঘন্টার মধ্যে ব্যবহার করতে হয়। তাই অনেক জায়গায় মেশিনের সাথেই সাইক্লোট্রন রাখা হয়।

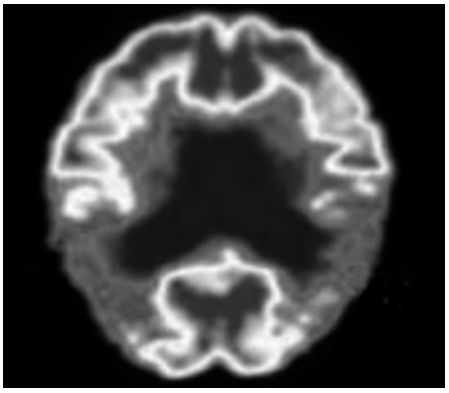

প্রঃ এই যে শুনি তেজষ্ক্রিয়তা শরীরের ক্ষতি করে, পেট স্ক্যান করে ক্ষতি হয় না?

উঃ এফ ডি জি অর্থাৎ তেজষ্ক্রিয় গ্লুকোজ এত সামান্য পরিমাণ ব্যবহার করা হয়, আর তার তেজষ্ক্রিয়তা এত তাড়াতাড়ি কমে যায় যে বিপদের আশঙ্কা নেই বললেই হয়। ৪-৬ ঘণ্টা খালি পেটে থাকার পর রক্তের সুগার চেক করে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। ২-৩ ঘণ্টার মধ্যে কাজ শেষ।

প্রঃ আর খরচাপাতি?

উঃ আজকাল মেশিন বসাতে খরচ প্রায় ১০ কোটি টাকা। আর প্রত্যেকবার স্ক্যান করতে আন্দাজ হাজার বিশেক টাকা লাগে। সরকারি হাসপাতালে কম খরচ, কিন্তু এ সুযোগ তো শুধুমাত্র কয়েকটি শহরে পাওয়া যায়। কাজেই প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম ক্ষেত্রে এর উপযুক্ত ব্যবহার সম্ভব হচ্ছে।

বলা বাহুল্য গ বাবুর পেট স্ক্যান হয়নি। ওনার মন ভালো নেই। চল্লিশ বছর রোজ দিনে চল্লিশটা সিগারেট খেয়েছেন— এখন আশঙ্কায় ভুগছেন। ওনাকে ক্যান্সারের লক্ষণ ও নিবারণের কথা জানাতে হবে, তবে সেটা আরেক দিনের জন্য তোলা থাক।

ঋণ স্বীকার :
ডা. অনীশ ভট্টাচার্য,
অতিরিক্ত অধ্যাপক,
নিউক্লিয়ার মেডিসিন বিভাগ,
পি জি আই এম ই আর, চন্ডীগড়।

- পেট স্ক্যান (PET Scan) হল রোগনির্ণয়ের অত্যাধুনিক ইমেজিং টেকনিক, তবে খরচ অনেক।
- ক্যান্সারের যে দশায় এক্সরে বা সিটিস্ক্যানে বিকৃতি দেখা যায় তার অনেক আগেই পেট স্ক্যান করে দেখা যায় কোথায় ক্যান্সার হয়েছে।
- চিকিৎসায় কেমন উপকার হচ্ছে বা চিকিৎসা শেষে দেহে কোন ক্যান্সার কোষ অবশিষ্ট রইল কি না, পেট স্ক্যান করে তা বোঝা যায়।
- এছাড়া সংক্রমণ ধরতেও পেট-স্ক্যানের ব্যবহার আছে।

লেখক পরিচিতিঃ ডা. সুস্মিতা ঘোষাল কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে এম বি বি এস পাশ করার পর চন্ডীগড়ে পি জি আই এম ই আর থেকে রেডিওথেরাপিতে এম ডি করেন; বর্তমানে সেখানেই অধ্যাপনায় রত। তাঁর পেশাগত জীবন কাটে ক্যান্সার রোগীদের চিকিৎসায়, গবেষণায় আর ডাক্তারি ছাত্রদের পড়ানোয়।

এখন **দু র্বা র ভা ব না** পাওয়া যাচ্ছে
শিলিগুড়িতে বুকস, কুচবিহারে পার্থ লাহিড়ী, এন এইচ রোড, নবদ্বীপের পোড়ামাতলায় সু জ য়া প্র কা শ নী পশ্চিম মেদিনীপুরের ভূ র্জ পত্র (বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি রোড), শান্তিনিকেতনে সু ব র্ণ রে খা।
কলকাতায়
হাওড়া স্টেশন (কলকাতা বাসস্ট্যান্ড, হাওড়া বাসস্ট্যান্ড), শিয়ালদহ স্টেশন (শানসাইন বুকস্টল, রামকৃষ্ণ পুস্তকালয় ও অন্যত্র)কলেজস্ট্রিট (পাতিরাম, বুকমার্ক, মণীষা গ্রন্থালয়, বইচিত্র ও অন্যত্র)।
রাসবিহারী মোড়, ফুলবাগান (বেলেঘাটা), হাতিবাগান, শ্যামবাজার (পাঁচমাথার মোড়), ঢাকুরিয়া (দক্ষিণাপণের বিপরীতে বইকল্প (দোতলায়), বিধাননগর (উল্টোডাঙা) স্টেশন ও অন্যত্র।
যারা পত্রিকার এজেন্সি নিতে চান সরাসরি আমাদের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।অথবা ফোন করুন ০৮৪২০০৬৬৫৯৪ অথবা ০৩৩২৫৪৩৭৫৬০।

প্যাথোলজি— চিকিৎসাশাস্ত্রের কাব্যে উপেক্ষিতা

প্যাথোলজি বিষয়টি নিয়ে আমাদের ধ্যানধারণা অতীব অস্বচ্ছ, কিন্তু তাতে অবশ্য 'ওই তো রক্ত-টক্ত ঘেঁটে দেখার ডাক্তারি' বলে নিজের পান্ডিত্য জাহির করতে কোনো অসুবিধা হয় না। এমনকি ডাক্তারেরাও প্যাথোলজি বিষয়টির চর্চায় যে বৌদ্ধিক উন্নতি লাভ করতে পারতেন সে-বাবদে খুব উৎসাহী নন, যদিও চিকিৎসাশাস্ত্রটা যে বিজ্ঞান সেটা বুক বাজিয়ে ব'লে তাঁরা বেশ আত্মপ্রসাদ অনুভব করেন। প্যাথোলজিই এই শাস্ত্রটিকে বিজ্ঞানের মর্যাদা দিয়েছে সেটা কারো চেতনায় সেভাবে আসে না,

লিখছেন **ডা. সর্বাণী চট্টোপাধ্যায়** ও **ডা. জয়ন্ত দাস**।

'মেটিরিয়া মেডিকার কাব্য' মনে পড়ে? সেই যে 'মায়ামৃগ' সিনেমায় বিশ্বজিতের লিপে মানবেন্দ্রর সোনার সময়ের গান? লাইনগুলো গুনগুন করলে এখনও গায়ে কাঁটা দেয়। আজ থেকে তিন দশকের বেশি আগে মেডিকেল কলেজে যখন ঢুকি তখন আমাদের সিনিয়ার দাদা-দিদিরা আমাদের অভ্যর্থনা জানিয়েছিল এই গানটা দিয়ে। বোধকরি বাংলা ব্যান্ডের এই রমরমার যুগেও সেই গান ফ্রেসার্স ওয়েলকামে এখনও কেউ কোনোদিন আনমনে গেয়ে ওঠে... ''হয়তো বা ফার্মাকোলজিটাই নিয়ে আজ লেকচারে নামবো...''।

কিন্তু না, আজ ফার্মাকোলজি নিয়ে লেকচারে নামবো না। কেন নামবো না তারও একটা গান আছে, কিন্তু সে গান বুঝতে হলে একটু একথা সেকথা বুঝতে হবে। ফার্মাকোলজি বা ভেষজবিজ্ঞান ওষুধপত্রের কারবারি। রোগ হলে কী ওষুধ দেবেন আর তা শরীরের মধ্যে গিয়ে কিভাবে কাজ করে সেই নিয়ে তার চোখ-ধাঁধানো কেরামতি। এক অর্থে ফার্মাকোলজি হল চাঁদে রকেট পাঠানোর মতো, টেকনিক্যাল প্রয়োগের চরম উৎকর্ষ, কিন্তু মৌলিক বিষয় নয়। যেমন মৌলিক বিষয় হল মহাবিশ্বকে জানা। সেই কোপারনিকাস-কেপলার-গ্যালিলিওর যুগ থেকে আজকের আবিষ্কার সতত সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্ব আর বিগ ব্যাং— এইসব না জানলে, অন্তত এসব নিয়ে একেবারে না ভাবলে, আপনার কাছে চাঁদের রকেট একটা উচ্চমানের খেলনার চাইতে বেশি কিছু নয়। না, আমরা রকেটের গুরুত্ব বিন্দুমাত্র খাটো করছি না, বা আধুনিক ফার্মাকোলজি যে অজস্র মানুষের প্রাণ বাঁচাতে পেরেছে সেটাকে কম করে দেখছি না। খালি বলতে চাইছি কিসের ওপর ভিত্তি করে ফার্মাকোলজি গড়ে উঠতে পেরেছে, কোন পথ বেয়ে সে যুগের মেটেরিয়া মেডিকা-র আজকের ফার্মাকোলজিতে উত্তরণ ঘটতে পেরেছে, সেটা জানা দরকার। কেবল ফার্মাকোলজি কেন, আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রের শিকড়টা ঠিক কোথায়, সেই চর্চা অল্পস্বল্প না করলে ডাক্তারদের কাজকর্ম গড়পড়তা মানুষের কাছে কেমন যেন ম্যাজিক হয়ে ওঠে, দৈব, তুকতাক বা জ্যোতিষের চাইতে তাকে আলাদা করার যে মূলসূত্র সেটা মানুষের চোখ এড়িয়ে যেতে থাকে। শুধু সাধারণ মানুষের কথাই বা বলি কেন? অভিজ্ঞ ডাক্তারের কাছেও কি চিকিৎসাবিদ্যাটা খানিকটা 'মেটিরিয়া মেডিকার কাব্য'-ই মাত্র হয়ে যায় না? 'মেটিরিয়া মেডিকা' জিনিষটা কী? সেটা হল কেবল রোগলক্ষণ মিলিয়ে ওষুধের ম্যাজিক ঝাঁপি থেকে ওষুধটা বেছে দেবার কৌশল, যেখানে 'কেন হয়, কী করে হয়, কিভাবে জানা গেল হয় কিনা' এইসব বেয়াদব প্রশ্ন উচ্চারিত হবার বড় বেশি ফুরসৎ পায় না।

আমাদের আজকের বিষয় হল চিকিৎসাশাস্ত্রের সবচেয়ে 'বেয়াদব' শাখাটি, যার কাজ হল প্রশ্ন করা। প্রশ্নের পর প্রশ্ন, উত্তর মিলুক আর নাই মিলুক সে ঘাড়-বাঁকা অবাধ্য নিষ্ঠা নিয়ে জিজ্ঞেস করে চলে, 'কিন্তু কেন? কিভাবে?' সে জানে, একটা সাদামাটা উত্তরের চাইতে একটা সঠিক প্রশ্ন শেষ পর্যন্ত মানুষের সামনে অনেক বড় আলিবাবার দরজা খুলে দেয়, আর সে খোলার কোনো সহজ চিচিংফাঁক রাস্তা নেই। এই বেয়াদব শাখাটির নাম প্যাথোলজি। আমাদের আজকের লেখা তাই প্যাথোলজির গভীর নির্জন কাব্য।

আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রের শিকড়টা ঠিক কোথায়, সেই চর্চা অল্পস্বল্প না করলে ডাক্তারদের কাজকর্ম গড়পড়তা মানুষের কাছে কেমন যেন ম্যাজিক হয়ে ওঠে, দৈব, তুকতাক বা জ্যোতিষের চাইতে তাকে আলাদা করার যে মূলসূত্র সেটা মানুষের চোখ এড়িয়ে যেতে থাকে।

আমাদের ডাক্তারি পড়া

ডাক্তারি পাশ করতে গেলে যে বিষয়গুলি আয়ত্ত করতে হয়, প্যাথোলজি তার মধ্যে অন্যতম। এখন আমরা যাদের ডাক্তারি পড়াই, সেই সব ছাত্রদের প্রথম বর্ষের পাঠ্য হল অ্যানাটমি, ফিজিওলজি ও বায়োকেমিস্ট্রি। এই তিনটি বিষয় শরীরের স্বাভাবিক অবস্থার গঠন, কার্যপ্রণালী ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে। এগুলো হল সবচেয়ে বুনিয়াদি বিষয়। কিন্তু নেহাত তর্কের খাতিরে অন্তত এগুলোকে একটু উল্টোভাবেও দেখা যেতে পারে। আমরা বলতেই পারি আসলে মানুষের অ্যানাটমি, ফিজিওলজি ও বায়োকেমিস্ট্রি নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে প্যাথোলজি চর্চার হাত ধরে। কেন মানুষ প্রথম ঢুকল তার লাশ কাটা ঘরে, তার অ্যানাটমির প্রথম দীক্ষায়? কেন মানুষ দেখতে চাইল কী কী রসে কিভাবে তার খাদ্য জারিত পাচিত হয়, কিসের তাড়নায় তার ফিজিওলজি ও বায়োকেমিস্ট্রির আঙিনায় প্রথম পদক্ষেপ? যদি রোগ-দুঃখ না থাকত, বা বুদ্ধদেবের পথে মানুষ রোগের মুক্তি খুঁজত কেবল নির্বাণে, তাহলে সে মানুষের হাতে কোনো অ্যানাটমি-ফিজিওলজি- বায়োকেমিস্ট্রির নির্মাণ সম্ভব হত না। বা অন্য কথায় মানুষ খুঁজতে চেয়েছে তার রোগের কারণ, আর খোঁজার পথে তার হাতে উঠে এসেছে সুস্থতার শরীর-মন, সে বুঝেছে অসুস্থতাকে বুঝতে গেলে আগে জানতে হবে সুস্থ শরীর কিভাবে কাজ করে। রোগের কারণ তথা প্যাথোলজি খুঁজতে গিয়ে তার নির্মাণ সুস্থ শরীরের আকার-অবয়ব কার্যকলাপ, সুস্থ শরীরের অ্যানাটমি-ফিজিওলজি-বায়োকেমিস্ট্রি। ঐতিহাসিকভাবে প্যাথোলজির সন্ধানই তাই প্রাথমিক, যদিও স্বাভাবিক কারণেই প্যাথোলজির

জ্ঞানভান্ডার পুষ্ট হয়েছে অ্যানাটমি-ফিজিওলজি-বায়োকেমিস্ট্রির সঞ্চয়ের হাত ধরে। স্বাভাবিক দেহকে জানার সিঁড়ি না পেরিয়ে মানুষ অসুস্থতার কারণ সন্ধানে এগোতেই পারেনি।

রোগের কারণ তথা প্যাথোলজি খুঁজতে গিয়ে তার নির্মাণ সুস্থ শরীরের আকার-অবয়ব কার্যকলাপ, সুস্থ শরীরের

আজকের ছাত্র যেভাবে চিকিৎসাবিজ্ঞান শেখে

ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র আগে শেখে অ্যানাটমি-ফিজিওলজি-বায়োকেমিস্ট্রি— তার চিকিৎসা বিজ্ঞান শেখার প্রথম সিঁড়ি। ফার্স্ট এম বি বি এস পরীক্ষায় অ্যানাটমি-ফিজিওলজি-বায়োকেমিস্ট্রির ঘাট পেরিয়ে তার চড়াই শুরু হয় যুগপৎ দুই পাকদন্ডী বেয়ে। একদিকে প্যাথোলজি, ফার্মাকোলজি, ফরেনসিক মেডিসিন, কমিউনিটি মেডিসিন ইত্যাদি। অন্যদিকে আই, ই এন টি, মেডিসিন, গাইনোকোলজি, সার্জারি, অর্থো-পেডিকস, পেডিয়াট্রিকস ইত্যাদি। বুদ্ধিমান পাঠক লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়ই, দ্বিতীয় দলে যেসব বিষয়গুলো আছে সেগুলো রোগীর সরাসরি চিকিৎসা করার সঙ্গে যুক্ত— যেমন সার্জারি। আর প্রথম দলে যেসব বিষয় তারা রোগীর সরাসরি চিকিৎসা করে না, কিন্তু রোগ চিকিৎসায় তাদের সহায়তা না পেলে চিকিৎসা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। মনে করুন একজন সার্জেন একটা টিউমার দেখে সেটা কেটে বাদ দিলেন। কিন্তু সেই টিউমারটা কি ক্যান্সার? বায়োপ্সি করে প্যাথোলজিস্টই কেবল সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন। আর ক্যান্সার কি ক্যান্সার নয় তার ওপর রোগীর চিকিৎসা নির্ভর করে, নির্ভর করে বাঁচা-মরাও। তেমনি একজন মেডিসিন বিশেষজ্ঞ রোগীকে পরীক্ষা করে দেখলেন রক্তাল্পতা রয়েছে, কিন্তু সেই রক্তাল্পতা কি থ্যালাসেমিয়া নাকি খাদ্যে লোহার অভাবের জন্য নাকি লিউকেমিয়া (রক্তের ক্যান্সার) নাকি অন্য কিছু সেটা ধরতে গেলে তাঁর প্যাথোলজি-কে দরকার, আর চিকিৎসা করতে গেলে দরকার ফার্মাকোলজিকে।

প্যাথোলজি কী নিয়ে চর্চা করে?

রোগের উপসর্গ (যেমন ম্যালেরিয়ায় কম্প দিয়ে জ্বর) ও লক্ষণ (যেমন ম্যালেরিয়ার রোগীর পেটের পিলে বেড়ে যাওয়া) আমাদের রোগের কারণ সম্পর্কে পুরো ধারণা দিতে পারে না। ম্যালেরিয়া রোগকে প্রমাণ করতে গেলে রোগীর রক্তে আণুবীক্ষণিক পরজীবী প্রাণীর অস্তিত্ব প্রমাণ করতে হবে, আর ম্যালেরিয়া রোগকে বুঝতে হলে রোগীর শরীরের গভীরে কোথায় কোনখানে কী ঘটছে সেটা জানতে হবে। এ জানা অনেকটা পেঁয়াজের খোসা ছাড়ানোর মতো, স্তরের পর স্তর ভেদ করতে করতে পুরনো ধাঁধার উত্তর পাওয়া যায়, কিন্তু কেবলই নতুন ধাঁধা জন্মাতে থাকে, জন্মাতেই থাকে। গোটা মানুষের রোগ খুঁজতে তার এক-একটা সিস্টেমে হানা দেওয়া। যেমন ধরুন জ্বর, তার কারণ খুঁজতে রোগীর শ্বসনতন্ত্রের হদিস নেওয়া। তারপর ফুসফুসে খুঁজে পাওয়া একটি দানা। সেই দানা বের করে কেটে দেখা, টিউমার? টিউমার হলে ক্যান্সার নাকি? মাইক্রোস্কোপের তলায় প্রতিটি কোষকে খুঁটিয়ে দেখা। কোষের নিউক্লিয়াস কেমন আচরণ করছে? কোষের ডি এন এ-র লম্বা শৃঙ্খল কোথায় সামান্য বদলে গিয়েছে, মিউটেশন জন্ম দিয়েছে কোন বিশৃঙ্খল কোষ-বিভাজনের? কোষের গায়ে লেপ্টে থাকা বিভিন্ন অণু কী বিদ্রোহ-সংকেত পাঠাচ্ছে তার পাশের কোষগুলিতে? অজস্র অণুতে কি অযুত-নিযুত ক্রিয়া-বিক্রিয়া সতত হয়ে চলেছে, আর সেই অতি সামান্য অতি ক্ষুদ্রের কাজ আমাদের জীবন-মরণের সীমানা নির্ধারিত করে দিচ্ছে।

বাউলগানে, বাউলের সাধনমার্গে, দেহভান্ডকে ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে— নেহাত ফেলনা তুলনা নয়। কোটি কোটি নক্ষত্রের সমাবেশে এক একটি নীহারিকা, আর কোটি কোটি নীহারিকা নিয়ে মহাবিশ্ব। এই বৃহতের মাঝে আবার অতি ক্ষুদ্রের লীলা। প্রতিটি নক্ষত্রে যে কত কোটি পরমাণু আছে তা ভাবলে মাথা ঘুরে যায়। এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরমাণুর প্রতিটিতে যদি ইলেকট্রন-প্রোটনের মধ্যেকার আকর্ষণ-বিকর্ষণ একটুমাত্র কম কি বেশি হতো তো গোটা ব্রহ্মাণ্ডটা হুড়মুড় করে লোপ পেত, আমাদের চেনা মহাবিশ্ব গড়ে ওঠাই সম্ভব হতো না।[১] তেমনি এই দেহে অজস্র অণুপরমাণুর প্রত্যেকটি তাদের ভূমিকায় অবিরত অভিনয় করে চলেছে। তাদের কেউ একজনও যদি ক্ষণিকের জন্য পার্ট ভুলে যায় তো তার ফলে গোটা দেহটাই বিকল হয়ে পড়তে পারে।[২]

ক্লিনিক্যাল মেডিসিন, যার মধ্যে মেডিসিন, সার্জারি, গাইনোকোলজি ইত্যাদি রয়েছে তাদের চর্চা মূলত দৃশ্যমানের জগতে। এই নয় যে তারা আণুবীক্ষণিক জগত সম্পর্কে অবহিতই নয়। তারা তত্ত্ব হিসাবে জানে রোগীর বুকে স্টেথোস্কোপ বসিয়ে কি নাড়ি টিপে কি জিভ দেখে যে ধারণা করতে পারা যায় তা মূলত বহির্ঘটনা, তাকে ব্যাখ্যা করতে গেলে রোগের কারণ (aetiology), কিভাবে হয় (pathogenesis), রোগীর রোগগ্রস্ত অংশের খালি চোখে দেখা বিবরণ (pathological anatomy) ও আণুবীক্ষণিক বিবরণ (histo-pathology) এবং সেই মাপকাঠিতে রোগনির্ণয় পদ্ধতি জানা দরকার। এই সবকটিই চর্চার মূল ক্ষেত্র প্যাথোলজি।

অর্থাৎ আমরা বলতে চাইছি, বিজ্ঞান হিসাবে

অজস্র অণুতে কি অযুত-নিযুত ক্রিয়া-বিক্রিয়া সতত হয়ে চলেছে, আর সেই অতি সামান্য অতি ক্ষুদ্রের কাজ আমাদের জীবন-মরণের সীমানা নির্ধারিত করে দিচ্ছে

চিকিৎসাশাস্ত্রের ভিত্তিভূমিটা স্থাপিত হয়েছে প্যাথোলজির ওপর ভর করে। এবং একজন চিকিৎসকের পক্ষে বৈজ্ঞানিকভাবে মানবশরীরকে দেখাটাও মূলত প্যাথোলজিতে তাঁর জ্ঞানের ফল, চিকিৎসকের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে দেয় প্যাথোলজি। আমরা কিন্তু চিকিৎসাশাস্ত্রের অন্যান্য শাখার ভূমিকা অস্বীকার করছি না। অ্যানাটমি-ফিজিওলজি-বায়োকেমিস্ট্রি এই তিন শাস্ত্রে প্রশিক্ষণ না থাকলে প্যাথোলজি বোঝা সম্ভব নয়। কিন্তু আবার পুরনো কথাটাই বলব, মানুষ একটা সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে চিকিৎসাশাস্ত্রের হাত ধরেছে; সেই সমস্যা হল রোগ। সুস্থ শরীরকে জেনে পন্ডিত হব প্রাথমিকভাবে এই আশায় সে অ্যানাটমি- ফিজিওলজি- বায়ো- কেমিস্ট্রির দুয়ারে হত্যে দেয়নি। বরং রোগকে জানার রাস্তা হিসেবে সে সুস্থ দেহকে জেনেছে। এ যেন বাউলগানের সেই লাইন, ''ঝিয়ের পেটে মায়ের জন্ম...'', যদি অবশ্য আমরা এ গানের বাউল-তত্ত্বের অনুষঙ্গ বাদ দিই। রোগের খোঁজে, শরীরের অস্বাভাবিক আচরণের কারণ খোঁজার তাগিদে মানুষ জানতে চাইল শরীরের কোন বিকারের ফলে রোগ হয়; অথচ তার সেই সন্ধান তাকে প্রথমে স্বাভাবিক শরীরের কাজ ও গঠনের জ্ঞানের কাছে নিয়ে এল, সে প্রথমে শিখল সুস্থ শরীরের অ্যানাটমি-ফিজিওলজি-বায়োকেমিস্ট্রি, এবং এখনও

অ্যানাটমি- ফিজিওলজি- বায়োকেমিস্ট্রির প্রায় সব আবিষ্কারের পেছনে থাকে রোগকে জয় করার বাস্তব তাগিদ। এই অর্থে প্যাথোলজি জ্ঞানের শাখা হিসাবে অ্যানাটমি- ফিজিওলজি- বায়োকেমিস্ট্রির অনুজ কিন্তু অগ্রাধিকারী। আর ফার্মাকোলজি - মেডিসিন- সার্জারি- গাইনি ইত্যাদিকে অস্বীকার করার বা খাটো করার প্রশ্নই নেই, কেননা প্যাথোলজির ভান্ডার ব্যবহার করে এরাই মানুষের কাছে সুফল পৌঁছে দিচ্ছে। আমাদের বক্তব্য শুধু এইটুকু যে চিকিৎসাশাস্ত্রকে বিজ্ঞান হিসেবে যতটা দাঁড় করানো গেছে তার মূল কৃতিত্ব যে বিষয়ের সেটি হল প্যাথোলজি।

এবার সাধারণ মানুষের মনে বহুদিন ধরে চলে আসা দু-একটি ভুল ধারণার কথা ভাবা যাক।

প্যাথোলজি—বুদ্ধি চর্চার একটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষেত্র

যখন কোনো রোগ সম্বন্ধে একজন ছাত্র পড়াশুনা করে, তখন রোগটির সমস্ত দিকগুলি তাকে আয়ত্ত করতে হয়। সেই সময় প্যাথোলজির সূত্রে সুস্থতা ও অসুস্থতাকে গাঁথতে হয়। এটি কোনো মুখস্থ করার জিনিস নয়, এটি বোঝার জিনিস, প্রায় এক আবিষ্কারের জিনিস। তাহলেই রোগটি কী, কেন, কোথায়, কিভাবে হচ্ছে তা সম্যক ভাবে বোঝা যায়। তার পরে অঙ্কের মতো যৌক্তিক ধারণায় গাঁথা পদক্ষেপগুলি চলে আসে। কোন পরীক্ষায় রোগটি ধরা পড়বে, কিভাবে রোগটি শরীরে সমস্যা তৈরি করে আর সেই সমস্যাগুলো কোন পদ্ধতিতে আটকানো যায়— এইসব সমস্যা যুক্তির সমস্যা, কোনো তৈরি ছক মেনে চলার সমস্যা নয়। ছক অবশ্য তৈরি করা হয়, কিন্তু সেগুলো আসলে যুক্তিসঙ্গত সমাধানের একটা রূপ। যুক্তিধারা ঠিকঠাক বজায় রেখে, সাক্ষ্য-প্রমাণের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে যে কেউ তাঁর নিজস্ব সমাধান-ছক বানাতে পারেন। আর একবার যদি কোনো রোগের কারণ ও রোগের গতিপ্রকৃতি বুঝে ফেলা যায় তো তার চিকিৎসা-প্রণালী নিয়ে ভাবনাটাও অনেক যুক্তি সঙ্গত হয়ে ওঠে।

মানুষের মনে একটা ধারণা আছে যে ডাক্তারি পড়তে গেলে প্রচুর মুখস্থ করতে হয়, বুদ্ধিশুদ্ধি বিশেষ লাগে না। অনেক ছাত্রছাত্রীই স্কুলে পড়ার সময় দেখে যে গণিত, পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নেরও অনেকটা একবার বুঝে নিলে দিব্যি আয়ত্ত্ব হয়ে যায়, অথচ ইতিহাস বা জীববিজ্ঞান চোখ বুজে মুখস্থ করতে হয়। এটাকে ইতিহাস বা জীববিজ্ঞানের স্বাভাবিক ধর্ম বলেই তারা ধরে নেয়, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় এই বিষয়গুলো পড়ানোর মধ্যে যে ত্রুটি আছে সেটা বুঝতে পারে না। তাদের মধ্যে অনেকে প্রথমেই ঠিক করে নেয়— ''ডাক্তারি পড়ব না, সারাক্ষণ অত মুখস্থ করা আমার দ্বারা হবে না''। অথচ হয়তো এই ছাত্র বা ছাত্রীটির মনের গঠন চিকিৎসক হওয়ার উপযুক্ত ছিল, সংবেদনশীলতা, সেবার মনোভাব, সবই ছিল, কিন্তু একটি ভুল ধারণার জন্য সমাজ একটি ভালো ডাক্তার পেল না। ডাক্তারি শিক্ষায় যে যুক্তি ও বুদ্ধি প্রয়োগের স্থান কিছু কম নেই, বরং বিশ্বের জটিলতম যন্ত্র মানবদেহ নিয়ে কাজ করতে হয় বলে সেখানে সবচেয়ে ক্ষুরধার মস্তিষ্কগুলিই দরকার, এই কথাটা আমাদের

> চিকিৎসকের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে দেয় প্যাথোলজি।

শিক্ষাবিদদের বুঝতে হবে, আর সেই বোঝানোর কাজে প্যাথোলজি বিষয়টির যুক্তিনির্ভর কাঠামোর ওপর যথাযথ গুরুত্বপ্রদান বড় হাতিয়ার ও উদাহরণ। কেননা আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রের গোটাটাই যদিও ভীষণভাবেই বুদ্ধিদীপ্ত যুক্তির ওপর নির্ভরশীল, তবু তার মধ্যেও প্যাথোলজির যৌক্তিক কাঠামোটি প্রাথমিক ও সহজে বোঝানো সম্ভব।

একজন ডাক্তারের কাছে প্যাথোলজির গুরুত্ব

এম বি বি এস করার সময়ে, এবং তার পরেও, একজন হবু ডাক্তারের (বা পুরো ডাক্তারের) প্যাথোলজি খুব ভালো করে জানা দরকার। না, শুধু পরীক্ষায় পাশ করার জন্যই নয়, এমনকি রোগীকে সারানোর কাজে সাফল্য অর্জনের জন্যও নয়, যদিও এ-দুটো কারণ নেহাত কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমরা যেটার ওপর জোর দিতে চাইছি তা হল, চিকিৎসকের যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকা জরুরি, এবং আমাদের দেশে বহু চিকিৎসকের মধ্যে যে দৃষ্টিভঙ্গির একান্ত অভাব, সেই দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার জন্য আমাদের এম বি বি এস কারিকুলামে সবচেয়ে কার্যকর বিষয় হল প্যাথোলজি।

এম বি বি এস পাশ করে ডাক্তার হবার জন্য এখন একটি ছাত্রকে সাড়ে চার বছর ধরে চোদ্দটি বিষয় পড়ে পাশ করতে হয়। এই পাঠক্রম তিনটি সেমেস্টারে বিন্যস্ত। বিষয়গুলি যেভাবে সাজানো তাতে সেগুলি যে ঠিক কিভাবে সম্পর্কিত তা একজন ছাত্রের কাছে মোটেও পরিষ্কার হয় না। কিন্তু সেমেস্টার শেষ হয়ে গেলে বিষয়টির সঙ্গে আর বিশেষ সম্পর্ক রাখতে হবে না, এমনও নয়। তাই ফাইনাল এম বি বি এস পরীক্ষায় ছাত্র বা ছাত্রীটি যখন 'ক্লিনিক্যাল সাবজেক্ট'-গুলো পড়ছে তখন তার অ্যানাটমি, ফিজিওলজি প্রভৃতি মনে থাকে না, পাশ করে ডাক্তার হয়ে গেলে তো আরোই মনে থাকে না। কিন্তু তা'বলে রোগী দেখার ক্ষেত্রে, রোগকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে বোঝার ক্ষেত্রে, ওইসব বিষয়ের গুরুত্ব কমে না। তাহলে কি হয়, ফাইনাল এম বি পাশ করে গেলেই আসে ইন্টার্নশিপ, তারপর পোস্টগ্র্যাজুয়েশন— ব্যস, তৈরি হয়ে গেল একজন স্পেশালিস্ট ডাক্তার, চর্চার গণ্ডীটা অনেক সীমাবদ্ধ হয়ে গেল।

এই অবস্থায় যেহেতু একজন ব্যস্ত ডাক্তারের বিভিন্ন বিষয়ের টেক্সট বই খোলার সময় থাকে না, তখন চিকিৎসা করাটা অনেক মেকানিক্যাল হয়ে যায়। বিভিন্ন অসুখের নিত্যনতুন ওষুধ আবিষ্কৃত হচ্ছে, রোগনির্ণয়ের পদ্ধতি পাওয়া যাচ্ছে, এবং বিভিন্ন বাণিজ্যিক সংস্থা ডাক্তারের কানে মন্ত্র দিয়ে যাচ্ছে, এই টেস্ট করলে ওই রোগটা ধরা পড়ে, অমুক ওষুধ দিলে তমুকটা সেরে যায়। আস্তে আস্তে ডাক্তারবাবু 'মেটেরিয়া মেডিকার কাব্য'-তে বুঁদ হয়ে যেতে থাকেন। তখন রোগের কারণ (aetiology), কিভাবে শরীরে রোগ এগোয় (pathogenesis)— এসব হয়তো কিছুই আর তাঁর মাথায় নেই। তিনি বাণিজ্যিক সংস্থার প্রতিনিধির কথা শোনেন, তাদের কাগজপত্রও পড়েন, কিন্তু সেগুলো যাচিয়ে দেখার

> চিকিৎসাশাস্ত্রকে বিজ্ঞান হিসেবে যতটা দাঁড় করানো গেছে তার মূল কৃতিত্ব যে বিষয়ের সেটি হল প্যাথোলজি।

অবস্থা তাঁর হয়তো থাকে না। তাঁর কলেজে পড়া জ্ঞান, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সময় থাকলে এই নতুন পরীক্ষানিরীক্ষা বা নতুন ওষুধগুলির সঠিক মূল্যায়ন ও ব্যবহার সম্ভব, অন্যথায় কোম্পানির লিটারেচার পড়ে প্রয়োগ করলে সেটা যথোচিত নাও হতে পারে। দিন দিন পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষমতা বাড়ছে এবং রোগের প্রতি আমাদের অ্যাপ্রোচের তফাৎ ক্রমে বাড়ছে। সেটা বুঝতে গেলে কিন্তু প্যাথোলজির বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি না থাকলে চলবেই না। যেমন, আগেকার দিনে বেশিরভাগ পরীক্ষায় একজন

মানুষের গোটা শরীরের কাজকর্ম পরীক্ষা করে দেখার চেষ্টা করা হত। কিন্তু এখন মানবশরীরের একটা ছোট অংশকে খুঁটিয়ে দেখা, তার জন্য সেই অংশটাকে প্রায় যথেচ্ছ মাত্রায় বিশ্লেষণ করে, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র স্তরে শারীরিক ক্রিয়াকলাপ বোঝা হচ্ছে। মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কোষ এবং কোষের আভ্যন্তরীণ কোষাঙ্গ, এমনকি অণুর আকৃতি-বিকৃতি এখন আমরা

> ডাক্তারি শিক্ষায় যে যুক্তি ও বুদ্ধি প্রয়োগের স্থান কিছু কম নেই, বরং বিশ্বের জটিলতম যন্ত্র মানবদেহ নিয়ে কাজ করতে হয় বলে সেখানে সবচেয়ে ক্ষুরধার মস্তিষ্কগুলিই দরকার।

ধরতে পারছি। ফলে রোগের গভীর কারণ ও উৎপত্তিস্থল নির্ণয় করা যাচ্ছে।

একটা উদাহরণ দেওয়া যেতেই পারে। আগে বাতব্যাধি (rheumatism)-কে একটা রোগ বলে ভাবা হতো। তারপর জানা গেল বিভিন্ন কারণে গাঁটে ব্যথা হতে পারে। অস্টিওআর্থ্রাইটিস, রিউম্যাটয়েড আর্থ্রাইটিস বা রিউম্যাটিক ফিভার— এরা সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা অসুখ। প্রথমটি বয়সের সাথে সাথে অস্থিসন্ধির ক্রমক্ষয়ের কারণে হয়, দ্বিতীয়টি একটি প্রদাহ জনিত অসুখ এবং তৃতীয়টি বিশেষ কিছু জাতির স্ট্রেপ্টোকক্কাস জীবাণুর সংক্রমণের পরে হয়। আগে এগুলি সবই প্রদাহ উপশমের ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করা হত, এখনও সেই ওষুধের যথেষ্ট গুরুত্ব সব ধরনের বাতব্যাধিতেই আছে। কিন্তু ধরা যাক রিউম্যাটয়েড আর্থ্রাইটিস— এর চিকিৎসায় এখন এসেছে এমন কিছু ওষুধ যারা অতি সুনির্দিষ্ট পথে কাজ করে। সেগুলি কিন্তু অন্য ধরণের বাতে আদৌ কার্যকর নয়, এমনকি রিউম্যাটয়েড আর্থ্রাইটিসের কোন অবস্থায় এটা দিতে হবে সেটাও খুব ভালোভাবে না বুঝলে প্রয়োগে হয়তো রোগীর লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশি হয়ে যাবে। যেমন TNF-1 নামের একটি অণু, যা কিনা রিউম্যাটয়েড আর্থ্রাইটিস-এ প্রদাহ তৈরি করতে সাহায্য করে, আণবিক স্তরে গিয়ে তার কাজ আটকানোর মাধ্যমে চিকিৎসা করা হচ্ছে। এই ধরনের ওষুধের সাধারণ নাম 'বায়োলজিক্যালস'। এরা কয়েকটি সুনির্দিষ্ট 'টার্গেট' অণুর ওপর কাজ করে। এইসব দামি ওষুধের সদ্ব্যবহার করতে গেলে দরকার রোগটির প্যাথোলজি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান, নচেৎ অনর্থক মশা মারতে কামান দেগে দেওয়া হবে। তাছাড়া এইসব ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও জটিল, সুতরাং কি দিচ্ছি, কেন দিচ্ছি এবং কাকে দিচ্ছি সে কথা বিচার করতে হবে আর সেই বিচারের সময় প্যাথোলজির জ্ঞান খুব দরকারি। আরও একটা উদাহরণ দিই। পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম-এ মেয়েদের ঋতুস্রাব অনিয়মিত হয়ে পড়ে আর তার সাথে ওভারিতে ছোট ছোট সিস্ট হয়; বন্ধ্যাত্ব দেখা দেয় ও তাছাড়া ওজনও বেড়ে যায়।[৩] এই অসুখের একটা কারণ হল যে শরীরে ইনসুলিন হরমোনটি কাজ করতে পারে না। দেহে ইনসুলিনের অভাব না থাকলেও, যে সংগ্রাহী অণুগুলির (receptor) মাধ্যমে ইনসুলিন কোষের মধ্যে ঢোকে সেই অণুগুলির ত্রুটি থাকে। মেটফরমিন নামে একটি ওষুধ ডায়াবিটিসের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়; সে ওষুধটি পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম-এও দেওয়া হয়। এখন কোনো রোগী যদি প্রশ্ন করেন তাঁর রক্তে শর্করার পরিমাণ স্বাভাবিক থাকা সত্ত্বেও কেন তাঁকে ডায়বিটিসের ওষুধ খেতে হচ্ছে, তাহলে তার উত্তর দিতে গেলে রোগটির প্যাথোলজি সম্যক জানতে হবে।

শেষ কথা

এবার আসি প্যাথোলজির দায় ও দায়িত্ব প্রসঙ্গে। প্যাথোলজিস্টও সার্জেন, গাইনোকোলজিস্ট, ডার্মাটোলজিস্ট প্রভৃতির মতোই একজন স্পেশালিস্ট, কিন্তু গোটা মানবশরীরের সমস্ত ধরনের কার্যকলাপ জুড়ে প্যাথোলজিস্টের

> প্যাথোলজি জীবনের রহস্যভেদের প্রতিজ্ঞায় প্রত্যয়ী।

বিচরণভূমি, অন্য স্পেশালিস্টের মতো কোনো অংশবিশেষ বা কার্যবিশেষে সীমাবদ্ধ নয়। সুতরাং তাঁর দায় বেশি, দায়িত্বও বেশি। যখন তিনি কোনো টেস্টের রিপোর্ট দেন, শুধু নির্দেশিত পরীক্ষাটি করেই তাঁর দায়িত্ব ফুরিয়ে যায় না। এই বিশেষ রোগ এবং রোগীটির পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর রিপোর্টের গুরুত্ব কোথায় তা তাঁকেই ব্যাখ্যা করে দিতে হবে। যে চিকিৎসক রোগীকে দেখছেন তিনি যা ভাবছেন তার বাইরে আর কোনো রোগ হওয়া সম্ভব কিনা, এবং তা যদি হয় সেক্ষেত্রে কোন পরীক্ষার দ্বারা রোগটি সুনিশ্চিতভাবে ধরা পড়বে তা বলে দিয়ে চিকিৎসকের ভাবনার দিগন্তকে বিস্তৃত করাও প্যাথোলজিস্টেরই কাজ।

আর্থার হেলী-র 'দ্য ফাইন্যাল ডায়াগনোসিস' বইটি পড়েছেন? প্যাথোলজিস্ট যা বলেন তা প্রমাণ করার দায় তাঁকে বহন করতে হয়, করতেই হয়। রোগী মারা যাবার পর মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানে ডাক্তারদের যে মিটিং হয় সেখানে প্যাথোলজিস্টের কথা সবচেয়ে দামি। সেই শেষের সময়েও প্যাথোলজিস্টের দায় থেকে যায় সত্যের প্রতি, বিজ্ঞানের প্রতি, এমনকি যখন এক রোগী আর বেঁচে নেই তখনো ভবিষ্যতের সমস্ত রোগীর জীবনের প্রতি।

কেননা প্যাথোলজি জীবনের রহস্যভেদের প্রতিজ্ঞায় প্রত্যয়ী।

পাদটিকা

১. স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স হল সেই বল যা পরমাণুর নিউক্লিয়াসের ভেতরে প্রোটন ও নিউট্রনদের একত্রে ধরে রাখে। একধরনের পরিমাপে তার মান দাঁড়ায় ০.০০৭। যদি এটা ০.০০৬ হতো তাহলে সৃষ্টি সম্ভব হতো না,র কেননা হাইড্রোজেন ছাড়া অন্য কোনো মৌল তৈরি হতে পারত না। আবার যদি এর মান হতো ০.০০৮ তাহলে হাইড্রোজেন খুব তাড়াতাড়ি ডয়টেরিয়াম ও হিলিয়ামে পরিণত হতো, সুতরাং নক্ষত্ররা বেশিদিন জ্বলত না, কেননা হাইড্রোজেনকে ফিউশন প্রক্রিয়ায় জ্বালিয়ে নক্ষত্রদের সমস্ত তাপ উৎপন্ন হয়।

২. যেমন ডি এন এ অণুর শৃঙ্খলে জায়গাবিশেষে একটা দুটো ওলটপালট (মিউটেশন) ঘটে গেলে ক্যান্সার আসতে পারে আর তা ছড়িয়ে পড়তে পারে আমাদের গোটা শরীরে।

৩. বিস্তৃত বিবরণের জন্য '**স্বাস্থ্যের বৃত্তে**' পত্রিকার এপ্রিল মে সংখ্যায় প্রকাশিত ডা. সঞ্জীব মুখোপাধ্যায়ের 'পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম বা পি সি ও এস' দ্রষ্টব্য।

লেখক পরিচিতিঃ ডা. সর্বাণী চট্টোপাধ্যায়, এম বি বি এস, ডি সি এইচ, ডি সি পি, এম ডি, কলকাতার একটি সরকারি মেডিকেল কলেজে প্যাথোলজির অধ্যাপক। এর বাইরে তাঁর আগ্রহের বিষয় হল সঙ্গীত, ফটোগ্রাফি, এবং অবশ্যই বহুমুখী পড়াশেনা।
ডা. জয়ন্ত দাস এম বি বি এস, এম ডি, পেশায় ত্বকরোগ বিশেষজ্ঞ। বিজ্ঞানের দর্শন তাঁর চর্চার একটি প্রিয় বিষয়।

জন্ম থেকে ছানি নিয়ে গবেষণা— একটি প্রত্যক্ষ বিবরণী

ভারতবর্ষে বহু জন্মান্ধ শিশু আছে যাদের দুই চোখে ছানি, আর সময়মতো এই ছানি কাটাতে পারলে তারা দৃষ্টিশক্তি পুরো ফিরে পেতে পারে। দুর্ভাগ্যক্রমে এদেশে প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞান যথেষ্ট উন্নত হওয়া সত্ত্বেও এসব শিশু, যাদের অধিকাংশই দরিদ্র গ্রামবাসীর সন্তান, তাদের খুঁজে-পেয়ে চিকিৎসা করার কোনও ব্যবস্থা নেই। আমেরিকার জাতীয় স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের টাকায় 'প্রোজেক্ট প্রকাশ' হল একদিকে গবেষণা-প্রকল্প যা মানুষের মস্তিষ্কে দৃষ্ট বস্তুর ধারণা কিভাবে গড়ে ওঠে সে ব্যাপারে স্নায়ুবিজ্ঞানে অগ্রগণ্য অবদান রেখেছে; অন্যদিকে এইসব শিশু-কিশোর-কিশোরীদের যতটা সম্ভব দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতে সাহায্য করছে— লিখছেন **ডা. গর্গ চট্টোপাধ্যায়**।

আমি হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রোসোপাগনোসিয়া (prosopagnosia) নিয়ে আমার পি এইচ ডি-র গবেষণা করেছিলাম। প্রোসোপাগনোসিয়া-গ্রস্ত মানুষরা জন্ম থেকেই মানুষের মুখ দেখে চিনতে পারেন না। কোনো একজন অতিপরিচিত মানুষকেও এঁরা সাধারণত দেখলে চিনতে ভুল করেন বা চিনতে পারেন না। এই বিষয়টি নিয়ে আমি প্রায় পাঁচ বছর গবেষণা করি। সারা বিশ্বে শতকরা প্রায় দু'জন মানুষ এমন মুখ না চেনার ব্যাধিতে কম-বেশি আক্রান্ত। এই গবেষণার শেষে আমি ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এম আই টি)-এর মস্তিষ্ক ও মনোবিজ্ঞান বিভাগে গবেষক হিসাবে যোগ দিই। তারপর থেকে আজ অবধি আমি যে ধরনের গবেষণা করে আসছি তা নিয়ে এখানে ছোট বিবরণ দেব।

গর্ভাবস্থায় বেশ কিছু ধরনের জীবাণু-ঘটিত রোগ সংক্রমণ (যেমন রুবেলা, হারপিস ইত্যাদি), অকাল প্রসব (অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ের বেশ আগেই প্রসব হওয়া) এ সমস্ত নানা কারণে কিছু ক্ষেত্রে শিশু দুই চোখে ছানি নিয়ে জন্মায়। সেই শিশুর ছানি যদি সময় মতো কাটানো না হয় তাহলে যে মহাবিপত্তি তা বলাই বাহুল্য। আমাদের মতো গরিব দেশে যেখানে সাধারণ শিশুদের অধিকাংশ খেতে পায় না, সেখানে লাখ লাখ শিশু দুই চোখে এমন ছানি নিয়েই থেকে যায়। চিকিৎসক মহলের ধারণা যে মোটামুটি ৭-৮ বছর অবধি যদি দু'চোখেই এমন ছানি থেকে যায়, তাহলে তারপর ছানি কাটিয়ে কোন লাভ নেই। তারপর ছানি কাটালে শরীরে ছানি থাকবে না এবং চোখের ভিতর আলো ঢুকবে বটে, কিন্তু মস্তিষ্কের যে অংশ দৃষ্টির সাথে যুক্ত, তা সেই নতুন করে ঢোকা আলো দিয়ে বিশেষ সুবিধা করতে পারে না। অর্থাৎ ঐ শিশুটির চোখ সর্বার্থেই খরচের খাতায়। গ্রামাঞ্চলে এরকম এক জীবন অভিশাপের চেয়ে কম নয়। এই অভিশাপ প্রসঙ্গে পরে আবার আসব।

> এই শিশুদের জন্য সেই সামান্য উন্নতিই জীবনযাত্রার মানে আনে বিরাট পরিবর্তন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের জাতীয় স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান (ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথ)-এর অনুদানে এম আই টি-তে আমাদের গবেষণাগার এই নিয়েই গবেষণায় রত। আমরা গবেষণা করে কী বুঝতে চাই? প্রথমত: আমরা এই ধারণাটিকে খুব ভালো করে পরীক্ষা করে দেখতে চাই যে আট বছরের পরে ছানি কাটলে সত্যিই কি কোনো উন্নতি হয় না? উন্নতির সংজ্ঞা নিয়ে অনেক আলোচনা ও পরিমাপ থাকলেও, আশা করি এটা বোঝা যাবে যে, চোখ পরীক্ষার কার্ডে ক্ষুদে অক্ষরের লাইন পড়ার উন্নতির কথাই শুধু বলা হচ্ছে না। এর চেয়ে যৎসামান্য উন্নতিও দুই চোখে ছানি পড়া শিশুদের জীবনে অনেক ফারাক এনে দিতে পারে। একটা উদাহরণ দিই। সামান্য উন্নতির ফলে বাচ্চাটি হয়তো রাস্তায় কে আসছে বুঝতে পারবে না, কিন্তু ডানদিক থেকে একটা বড় কিছু দ্রুত আসছে, সেইটুকু বুঝতে পারবে। সামনে থেকে তার মা'কে চিনতে না পারলেও শাড়ি পরা মহিলা এইটুকু কাছে গেলে বুঝতে পারবে। উন্নতি কি, এই কথাটার উত্তর খুঁজতে হলে হয়তো আমাদের দৃষ্টিমানদের বৌদ্ধিক সংবেদনশীলতা বাড়াতে হবে। প্রায়-অন্ধকারের পরিপ্রেক্ষিত থেকে আমাদের এই দুনিয়াটা বুঝতে হবে। আর সেটা করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। আমার এক বন্ধু সমাজকর্মি, অ্যাসোসিয়েশান অব ইন্ডিয়া'স ডেভলপমেন্ট-র প্রতিষ্ঠাতা রবি কুচিমাঞ্চি বলে থাকে, ''দুর্বলের আওয়াজ প্রায়শই বড় ক্ষীণ, নিজেরা আমরা বড় জোর গলায় বলতে অভ্যস্ত— তাই সেই আওয়াজ আমরা শুনতে পাই না। সেই আওয়াজ শোনার জন্য বিশেষভাবে কান খাড়া করা প্রয়োজন।''

অন্ধত্ব বা প্রায় অন্ধত্ব নিয়ে আরেকটা ব্যাপার হল, তারা কি পারে বা পারে না সেটা আমরা, যারা দৃষ্টিমান তারাই ঠিক করে দিই। এর মধ্যে যে একটা গোড়ায় গলদ আছে তা বলাই বাহুল্য।

আমরা, একদল গবেষক, দিল্লিতে যাই সেখানকার শরফ দাতব্য চোখের হাসপাতালে। ১৯২০-র দশকে তৈরি এই হাসপাতাল সারা উত্তর ভারতে দাতব্য চিকিৎসার জগতে এক পথিকৃৎ। এই বছর জানুয়ারি মাসেও আমরা

গিয়েছিলাম সেখানে। এই হাসপাতালের দুটি ঘর জুড়ে আমাদের ভারতের গবেষণাগার। গবেষণা প্রণালী অনেকটা এরকম: প্রথমত, চোখের প্রযুক্তিবিদ বা অপ্টোমেট্রিস্ট-দের দল পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ইত্যাদির নানা প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়ে শিবির করে। প্রত্যন্ত এলাকাতে গিয়েই তারা বেশি শিবির করে, কারণ এইসব এলাকাতেই জন্ম থেকে ছানি থাকা সত্ত্বেও চিকিৎসা না পাওয়া, ছানি না কাটা শিশু পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হেলথ (এন আই এইচ)-এর অনুদানে ম্যাসাচ্যুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (এম আই টি) অর্থাৎ দুটি আমেরিকান প্রতিষ্ঠানের এই গবেষণা কেন আমরা ভারতবর্ষে এসে করছি তার নেপথ্য কাহিনীটা দুঃখের। পশ্চিমী বিশ্বে এত বেশি সংখ্যক শিশু দু'চোখে ছানি নিয়ে জন্মায়ই না, গর্ভবতী মায়ের উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা, সহযোগী চিকিৎসক ও সমাজকর্মিদের কারণে। তা সত্ত্বেও যারা এমন ভাবে জন্মায় তাদের ছানি কাটা হয়ে যায় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। আফ্রিকা মহাদেশের নানা জায়গায় আমাদের মতই দু'চোখে ছানি নিয়ে অনেক শিশু জন্মায়, এমন ছানি কাটাও হয় না তাদের। ওখানে গবেষণা করি না আমরা কারণ ওখানে মস্তিষ্কের গঠনের ভালো ছবি তোলার উন্নত যন্ত্রপাতি ও পরিকাঠামো বিশেষ নেই। ভারতে যেমন উন্নত চিকিৎসাযন্ত্র ও পরিকাঠামো আছে পয়সাওয়ালাদের জন্য, একইসঙ্গে ৮ বছর বয়স অবধি ছানি না কাটা লাখো শিশু রয়েছে। এক অর্থে ভারতের এই বিশাল বৈষম্য ও বৈপরীত্যের কারণেই এই জায়গা এই গবেষণার উপযুক্ত স্থল। ভারতবর্ষকে কেন্দ্র করে আমাদের গবেষণা চলার কারণটা খুব গর্বের নয়, বেদনার। যাই হোক, আমাদের অপ্টোমেট্রিস্টদের শিবির থেকে কিছু নিয়মাবলী অনুযায়ী বেছে বেছে কিছু জন্ম থেকে ছানি থাকা শিশু ও তাদের বাড়ির লোককে দিল্লি আনা হয়। দিল্লিতে তাদের ছানি কাটানো হয়, ছানি কাটার পরে তাদের নানারকম জিনিস চিনতে বা দেখতে বলা হয়। এই পরীক্ষাগুলির মধ্যে রয়েছে— কমপিউটারের পর্দায় ভেসে ওঠা কোনো একটি ছবি আদৌ একটি মুখ কি মুখ নয়, পর্দাতে ভেসে ওঠা একটি দৃশ্যে মুখটা কোথায় অবস্থিত তা আঙুল দিয়ে দেখানো, মুখ দেখে লিঙ্গ নির্ণয়, মুখব্যাদান দেখে মনের ভাব নির্ণয়— খুশি না দুঃখিত না রেগে নাকি ভয় পাওয়া ইত্যাদি। এছাড়া আমরা পরীক্ষা করি তারা কত ছোট জিনিস দেখতে পায়, কোনো আবছা জিনিস দেখতে পায় কিনা, ছোট ছোট কয়েকটি বিন্দুর গতির দিক বুঝতে পারে কিনা ইত্যাদি। এইসব পরীক্ষাগুলি এম আই টি ও হাভার্ডে আমরা নানা সময়ে নিজেরা তৈরি করেছি। অথচ যে দেশে এই অন্ধত্বের এত প্রকোপ সেখানে দৃষ্টিবিজ্ঞান ও মস্তিষ্ক গবেষণার জন্য এই ধরনের পরীক্ষা তৈরি হয় না— এটা দুঃখের কথা। আমরা এই পরীক্ষাগুলি করি এই শিশুদের উপর— ছানি কাটানোর আগে, দিন দুয়েক পরে, তিন মাস পরে, ছ'মাস পরে— এইভাবে। এর ফলে দৃষ্টিশক্তি এবং ব্যবহারিক দৃষ্টিশক্তির সময়ের সঙ্গে কেমন তারতম্য ঘটছে তার একটা আন্দাজ আমরা পাই।

ভারতে যেমন উন্নত চিকিৎসাযন্ত্র ও পরিকাঠামো আছে পয়সাওয়ালাদের জন্য, একইসঙ্গে ৮ বছর বয়স অবধি ছানি না কাটা লাখো শিশু রয়েছে। এক অর্থে ভারতের এই বিশাল বৈষম্য ও বৈপরীত্যের কারণেই এই জায়গা এই গবেষণার উপযুক্ত স্থল। ভারতবর্ষকে কেন্দ্র করে আমাদের গবেষণা চলার কারণটা খুব গর্বের নয়, বেদনার।

আপাতত এই গবেষণা চলছে পুরোদমে। কিছু আশাব্যঞ্জক প্রাথমিক ফলও আমরা পেয়েছি যার ফলে দেখা যাচ্ছে যে অনেক বছর ছানি থাকলেও শিশুটির ছানি কাটলে সামান্য কিছু দৃষ্টিশক্তি সে ফিরে পায় (পাঠক যেন না ভোলেন যে আমাদের ভাষায় বা বোধে যা 'সামান্য' সেইটা জীবন ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই প্রায়-অন্ধ শিশুদের ক্ষেত্রে অনেক)।

দিল্লিতে বসে উত্তরপ্রদেশ তথা উত্তর ভারতের অন্যান্য জায়গায় কাজ করে নানা অভিজ্ঞতা হয়েছে যা আমার চেতনাকে ভীষণভাবে প্রসারিত করেছে। উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন জায়গায় শুনেছি এমন সব মিষ্টি ভাষা এই শিশুগুলির মুখে যা কিনা সরকারের কথায় 'হিন্দি' বলে চালিয়ে দিলেও আসলে একান্তই এলাকাগত ভাষা। এই ভাষাগুলিই আজ ধ্বংসের মুখে, হিন্দির দ্বারা আত্মস্মাৎ হয়ে যাচ্ছে। ভুললে চলবে না, বঙ্গদেশেও তথাকথিত 'চলিত বাংলা'ও এমন অনেক মনের ভাষাকে আত্মসাৎ করেছে, হত্যা করে চলেছে। দিল্লিতে এই শিশুদের কাছে দেখেছি শীতের রাতে মোবাইলের অনন্য ব্যবহার গান বাজনা শোনার যন্ত্র হিসেবে। মোবাইলে চোরা ভাবে মৈথিলি গান হচ্ছে, এবং সেটিকে ঘিরে মঙ্গল, পুরুষোত্তম, মাধবেরা সকলে বসে আছে। চালাতেও জানে এরা— আগে থেকে ভরে রাখা গান কিভাবে বোতাম টিপে পৌঁছে যেতে হয় তাও জানে। গল্প করেছি অঙ্কিতের মায়ের সাথে। তার চার সন্তানের দু'টি এমন ভাবে জন্ম থেকে ছানি-ওয়ালা। স্বামী খুব একটা কিছু করে না। পাড়াপড়শি তাকে অভিশপ্তা ও পাপিষ্ঠা বলে গালমন্দ দেয়, কারণ তার গর্ভে এমন দুই জন ছানিযুক্ত শিশু জন্মেছে। এরই মধ্যে সে সংসার চালিয়েছে এদের সকলকে নিয়ে। মাঝে মাঝে যে তার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করে, এটা যখন সে সজল চোখে জানায় তখন কাশ্মীর-পাকিস্তান, জনগণমন, তেরঙ্গা, BSF, CRPF, GDP এসব অবান্তর ও নিষ্ঠুর নাটক মনে হয়। মনে পড়ে যাচ্ছে আবার নাদিম ও সাবিনাকে— সহোদর ভাইবোন। এদের ছানি জন্ম থেকে হলেও ছানি ঘন নয়, একটু আধটু দেখতে পারে। একজন যখন পর্দার দিকে তাকিয়ে উত্তর দিচ্ছে, অন্যটি তাকে দিল কিলিয়ে! তারপর শুরু হল ধুন্ধুমার লড়াই। গবেষকের তখন গবেষণা চুলোয় গিয়ে মারামারি থামানোর চেষ্টাই হয়ে উঠছে মুখ্য। মনে পড়ছে আমার সাথে নানা কথা বলতে বলতে মঙ্গলের খেদোক্তি। অপারেশানের সময় তাকে জামা ছাড়তে হয়েছিল। জামার পকেটে কুড়িটা টাকা ছিল। পরে দেখে আর নেই। ঠিক ছিল ওই কুড়ি টাকা দিয়ে ট্রেন ফিরতি এই এই খাবে। আমি খুব বড়লোক নই, কিন্তু কুড়ি টাকাকে কেন্দ্র করে যে কিছু কাজের, কিছু স্বাদ-আহ্লাদ, স্বপ্নের ইচ্ছে জড়িত থাকে সেইটা কিছু সময়ের জন্য আমাকে কুরে কুরে খায়। এই চোদ্দ বছরের মঙ্গলই আমায় জানায় সে মাঝে একটু একটু জর্দা খাওয়া ধরেছিল, কিন্তু এখন ছেড়ে দিয়েছে। সে 'লক্ষ্য' করেছে যে তার গ্রামের বেশি বেশি নেশা করা লোকেরা শেষে তাদের জমি বন্ধক দিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছে। তার অর্ন্তদৃষ্টির তারিফ করতে গিয়ে বুঝলাম এই তারিফের মধ্যে মঙ্গলকে কতটাই না ছোট করছি।

মার্কিন সরকারের অনুদানের টাকায় ছানি কাটিয়ে পরীক্ষা করানো হয়। গবেষণার কাজটাজ হওয়ার পর শিশুরা ও তাদের বাড়ির লোকেরা ফেরৎ যায়— অনেকেই আমাকে ও অন্যান্য গবেষক কর্মিকে প্রণাম করতে যায়। শরীরে অপরাধবোধের শিহরণ খেলে যায়।

একটি সাক্ষাৎকার

পবন সিন্‌হা এম আই টি-র মস্তিষ্ক ও মনোবিজ্ঞান বিভাগের খ্যাতনামা অধ্যাপক। ট্রল্যান্ড প্রাইজের মাধমে তার অধ্যয়ন ও গবেষণার স্বীকৃতি দিয়েছে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান মহল। জন্মসূত্রে ভারতীয় এই বিজ্ঞানী দেশ-বিদেশে সমাদৃত 'প্রোজেক্ট প্রকাশ'-এর রূপকার হিসাবে যার মাধ্যমে চোখে ছানি নিয়ে জন্মানো শিশুরা পাচ্ছে আশার আলো— বাস্তবিক ভাবেই, রূপকার্থে নয়। জনসেবা ও উচ্চমানের বিজ্ঞানচর্চা কিভাবে একসাথে করা যায় তার জীবন্ত নিদর্শন এই বিজ্ঞানী। আমি যখন তাঁর সহকর্মি ছিলাম তখন এম আই টি-তে তাঁর গবেষণাগারে বসেই এই সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম।

গর্গ চট্টোপাধ্যায় ঃ তোমার বিজ্ঞান জগতের এই শিখরে পৌঁছানোর যাত্রাপথটি যদি একটু বর্ণনা কর।

পবন সিন্‌হা ঃ প্রথমে দিল্লিরই এক সরকারি ইস্কুলে পড়তাম। তারপরে রামকৃষ্ণপুরমের দিল্লি পাবলিক স্কুলে পড়ে স্নাতক স্তরে যোগ দিই দিল্লির ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (আই আই টি)-তে। আই আই টি-তে গণনজ্ঞানে স্নাতক হওয়ার পরে ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া, বার্কলি-তে গেলাম আমার পি এইচ ডি-র জন্য। আমি ভাবছিলাম আমি সুপার কমপিউটার স্থাপত্যবিদ্যা নিয়ে, যা কিনা একদম মূলধারার গণন বিদ্যার মধ্যে পড়ে। কিন্তু আমি বার্কলিতে যা দেখলাম সুপার-কমপিউটার গবেষণা নিয়ে, তা বিজ্ঞানের ব্যাপকতর জগতে অভিযান করার জন্য খুব একটা উৎসাহব্যঞ্জক মনে হল না। আমি ধী-শক্তি, বিশেষত কৃত্রিম ধী-শক্তি (artificial intelligence) নিয়ে আগ্রহী ছিলাম। বার্কলিতে থাকাকালীন আমি স্নায়ুবিজ্ঞান পঠন-পাঠনে অংশগ্রহণ করতে শুরু করলাম। ক্রমে তা আমাকে বেশি বেশি আকর্ষণ করতে থাকল। আমি স্নায়ুবিজ্ঞানের দিকে চলে যাচ্ছিলাম, কিন্তু আমি গণনবিজ্ঞানে আমার ভিত্তিকে সম্পূর্ণ অবহেলা করতে চাইছিলাম না। তাই আমি গণনভিত্তিক স্নায়ুবিজ্ঞান করবো ভাবলাম। বার্কলিতে সেই সময় গণনভিত্তিক স্নায়ুবিজ্ঞানের পঠন ও গবেষণার ধারা খুব একটা জোরালো ছিল না। ফলে বার্কলিতে এক বছর কাটানোর পরে আমি ম্যাসাচ্যুসেটস ইনস্টিটিউট (এম আই টি)-তে পি এইচ ডি করতে যোগ দিলাম সেখানকার প্রবাদপ্রতিম কৃত্রিম ধী-শক্তি গবেষণাগারে, গণনবিজ্ঞানের বিভাগেই। পি এইচ ডি-উত্তর গবেষণাকালে আমি একদম মস্তিষ্কবিজ্ঞানের দিকেই চলে গেলাম। ইউনিভার্সিটি অব উইসকনসিন, ম্যাডিসন-এ মনোবিজ্ঞান বিভাগে অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেওয়ার দেড় বছরের মধ্যেই এম আই টি থেকে আমন্ত্রণ পেলাম সেখানে যোগ দেওয়ার জন্য, এবার অধ্যাপক হিসেবে। ফলে ১৯৯৯-এ এম আই টি-তে প্রত্যাবর্তন। সেই থেকে আমি এখানেই।

গর্গ ঃ 'প্রজেক্ট প্রকাশ' শুরু হওয়ার আগে তুমি কী কী ধরনের গবেষণার সাথে যুক্ত থেকেছো, তা যদি আমাদের পাঠকদের প্রাঞ্জল ভাষায় বোঝাও।

পবন ঃ একটু আগে যেমন বললাম, আমার গবেষণা শুরু কমিপউটার স্থাপত্য-বিদ্যা দিয়ে— যা আর কিছু নয়, একটি পরিগনক বা কমপিউটারের মূল ক্রিয়া যন্ত্রের নকশা নিয়ে কারবার। এই ক্রিয়াযন্ত্রকে কতটা দ্রুত, কতটা কর্মদক্ষ করে তোলা যায় এই আর কি। আমার স্নাতক স্তরের গবেষণা ছিল সুপার-কমপিউটার নিয়েই এবং পি এইচ ডি-র প্রথম দিকেও আমি উচ্চ-ক্ষমতাশালী সুপার-কমপিউটারের ব্যাপারে কাজ করতে থাকি। ক্রমে অবশ্য আমি অন্য এক ধরনের উচ্চ-ক্ষমতাশালী পরিগণন নিয়েই গবেষণা শুরু করলাম, যে ধরনের পরিগণন আমাদের মস্তিষ্ক করে থাকে। একটু গতানুগতিক ভাবে বললে মস্তিষ্ক হল একটি সুপার-কমপিউটার, এর মধ্যে কোটি কোটি ক্রিয়াযন্ত্র আছে, যাকে আমরা স্নায়ুকোষ বলি, যেগুলি একসাথে অসাধারণ আচার-আচরণের উদ্ভব ঘটায়। বিশেষত আমি খুবই আকর্ষিত হয়ে পড়লাম দৃশ্যগত তথ্যের (যে তথ্য আমাদের চক্ষুদ্বয় আমাদের মস্তিষ্ককে দেয়) উপর আমাদের মস্তিষ্ক কিরূপে ক্রিয়াশীল হয়। আমার চিরকাল চিত্রকলা নিয়ে আগ্রহ ছিল এবং আমার জানতে ইচ্ছে করতো যে চিত্রকররা কিভাবে কিভাবে সামান্য কিছু দাগের মাধ্যমে সম্পূর্ণ একটি বস্তুর চিত্রকল্পকে বুঝিয়ে দিতে পারেন। ভালো চিত্রকরেরা বহির্জগতের বস্তুকে আঁকার সময়ে প্রতিটি দাগ-উঁচু-নিচু-ছায়াকে একইভাবে বানান না, বরং সামান্য কিছু রেখার মাধ্যমেই তাঁরা বহির্জগতে দৃশ্য বস্তুসমূহের নির্যাসটুকু বুঝিয়ে দিতে সক্ষম হন। আমার প্রশ্ন ছিল, একটি বস্তুকে বুঝতে তার সম্বন্ধে কি ন্যূনতম তথ্য মস্তিষ্কের দরকার হয়। ভিস্যুয়াল নিউরোসায়েন্স বা দৃষ্টিগত স্নায়ুবিজ্ঞানের এটি কেন্দ্রিয় প্রশ্ন। এই নিয়ে আমার পি এইচ ডি-র কাজ। এম আই টি-তে গণনবিজ্ঞান বিভাগে তথা কৃত্রিম ধী-শক্তি গবেষণাগারের খোলামেলা আবহাওয়ায় আমি স্নায়ুবিজ্ঞান ও গণনবিজ্ঞান দুই-ই মিলিয়ে কাজ করলাম। সাথে যোগ হল পরিগণনভিত্তিক দৃষ্টি (Computer Vision)। মূলত কাজ করলাম বস্তু চেনার মস্তিষ্কগত প্রক্রিয়া নিয়ে। এছাড়াও কাজ করলাম ত্রি-মাত্রিক (three-dimensional) বস্তুর অনুভব বা প্রত্যক্ষকরণের মস্তিষ্কগত প্রক্রিয়াগুলি নিয়ে। আমরা দ্বি-মাত্রিক চিত্র দেখে তার থেকে ত্রি-মাত্রিক তথ্য নিরূপণ করি। বস্তু ঠাহর করার প্রক্রিয়াগুলি কিভাবে এই ত্রি-মাত্রিকতার ওপর নির্ভরশীল এবং একই সাথে ত্রি-মাত্রিক তথ্যের নিরূপণকে আলোকিত করে? এই নিয়ে গবেষণার কয়েক বছরের শেষে আমার এই উপলব্ধি হতে থাকল যে দৃষ্টিগত শিক্ষা (visual learning) যে

কোনো বস্তুর মস্তিষ্কগত ভিত্তির জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। স্মৃতিতে কোনো বস্তু থাকলে এটা বোঝা খুব গুরুত্বপূর্ণ, একটি বস্তুর স্মৃতির ভিত্তি কিভাবে রচিত হয়, মস্তিষ্ক পরিমন্ডল থেকে সেই তথ্য জোগাড় করতে শিখল কিভাবে— এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজাই হয়ে উঠল আমার গবেষণা প্রকল্পের কেন্দ্রবিন্দু— এবং এক অর্থে আমি আজও যে প্রশ্নের উত্তর খুঁজে চলেছি গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে, তাও গোদা ভাবে এই প্রশ্নের সাথে জড়িত। আমি নানা ভাবে গবেষণা করেছি, নানা ধারায়। কিন্তু সেইসব ধারাকে একটু গভীর ভাবে অধ্যয়ন করলে বুঝতে পারা যাবে যে সেসবই এই মৌলিক প্রশ্ন থেকে উৎসারিত।

গর্গ ঃ গত কয়েক বছর বিশ্বের নানা মহলে তোমার 'প্রোজেক্ট প্রকাশ' অসামান্য খ্যাতি লাভ করেছে। 'প্রোজেক্ট প্রকাশ' কী? এছাড়াও আমি জানতে চাই, জনসেবা ও গবেষণার এই অনন্য যুগলবন্দির ভাবনা কি করে তোমার মাথায় এল?

পবন ঃ আমি প্রশ্নগুলির উত্তর একসাথেই মিলিয়ে মিশিয়ে দিচ্ছি। প্রোজেক্ট প্রকাশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের (এন আই এইচ) অনুদানে চলা একটি বিজ্ঞান প্রকল্প যার মাধ্যমে আমার গবেষণা-গোষ্ঠী ভারতবর্ষের প্রত্যন্ত গ্রামের জন্ম থেকে ছানির ফলে দৃষ্টিহীন বা প্রায়-দৃষ্টিহীন মানুষের ওপর অস্ত্রোপচার করছে এবং তাদের দৃষ্টি ও মস্তিষ্ক প্রক্রিয়া নিয়ে গবেষণা করছে।

'প্রোজেক্ট প্রকাশ'-এর উদ্ভব আমার দুটো অভীপ্সার মধ্য থেকে। প্রথমটি হল একটি বৈজ্ঞানিক ঈপ্সা, এটা জানার ইচ্ছা যে মস্তিষ্ক কিভাবে দেখতে শেখে। অন্যটি হল বাস্তব জগতে অন্য মানুষের জীবন ছুঁয়ে যায়, এমন কিছু করার এক ইচ্ছে। কিছুটা কাকতালীয় ভাবে এই দুটি জিনিস একসাথে চলে আসে। দৃষ্টিগত শিক্ষার প্রশ্নটির কিভাবে উত্তর পাব, তা নিয়ে আমি অনেককাল ভাবনাচিন্তা করেছিলাম। তুমি জানোই যে এই বিষয়ে পরীক্ষামূলক কাজের সংখ্যা খুবই কম। এক হচ্ছে শৈশবের একদম প্রথমদিকে বাচ্চাদের ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা। কিন্তু তাতে নানা সমস্যা। ৬-৭ মাসের কম বয়সের একটি শিশু ঠিক মস্তিষ্ক-বিজ্ঞানের পরীক্ষা করতে উৎসাহী নয়— তার আচরণ অন্যান্য নানা চাহিদা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এছাড়া ৬-৭ মাস বয়সের মধ্যে সেই শিশুর দৃষ্টিক্ষমতা হয়ে ওঠে পটু। অর্থাৎ দৃষ্টির বিকাশপ্রক্রিয়ার অনেক বড় ঘটনা প্রথম কয়েক মাসের মধ্যেই সম্পূর্ণ হয়ে যায়। মনুষ্য শিশুর বদলে পশু বা পশুশাবকের সাথে কাজ করা আরও কঠিন। কীভাবে কী করা যায়, এই চিন্তা আমার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। সেই সময়ে আর একটা ঘটনা ঘটে। ভারতে পরিবারকে আমি দেখতে

মার্কিন সরকারের অনুদানের টাকায় ছানি কাটিয়ে পরীক্ষা করানো হয়। গবেষণার কাজটাজ হওয়ার পর শিশুরা ও তাদের বাড়ির লোকেরা ফেরৎ যায়— অনেকেই আমাকে ও অন্যান্য গবেষক কর্মিকে প্রণাম করতে যায়। শরীরে অপরাধবোধের শিহরণ খেলে যায়।

আসি নিয়মিত। এমনি এক যাত্রার সময়ে আমি এমন এক দৃশ্য দেখেছিলাম, যা আমি বড় হয়ে ওঠার সময়ে অনেকবার দেখেছি। কিন্তু যে অনুভূতি সঞ্চার হয়েছিল সেই দৃশ্য দেখে, তা আগে কখনো হয়নি। ঘটনাটি এমন— নিদারুণ শীতে নতুন দিল্লির একটি ট্রাফিক মোড়ে জরাজীর্ণ ন্যাকড়া-পরিহিত ৩-৪ বছরের দৃষ্টিহীন বাচ্চার ভিক্ষে চাওয়া। এ এমন এক দৃশ্য যা খুবই পীড়াদায়ক। আরও বেশি পীড়াদায়ক কারণ আমরা জানি যে একে সহ্য করা সম্ভব। যখন কারুর কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকে, এবং যদি আমরা জানি যে এই প্রতিবন্ধকতা দূর করা সম্ভব— তখন সেইটা একটা মানসিক পীড়ার সৃষ্টি করে। এই পীড়া মানুষকে নাড়িয়ে দেয়, ভাবিয়ে তোলে। ফলে চোখে ধবধবে সাদা ছানিযুক্ত শিশুদের দেখে একজন বিজ্ঞানী, একজন ভারতীয় হিসেবে মনে হল, এটা চলতে দেওয়া যায় না, এটা নিয়ে কিছু একটা করা দরকার, এর সমাধান দরকার। একই সাথে মনে হল, যে এই মানবিক সমস্যার সমাধানের মধ্যে হয়তো লুকিয়ে আছে সেই বৈজ্ঞানিক সমস্যার সুরাহা, যা নিয়ে আমি বেশ কিছুকাল ভাবছিলাম। যদি আমরা এমন শিশুদের মধ্যে পরীক্ষা করি, যাদের ৭/৮ বছর বা তারও বেশি বয়সী এবং যারা ছানির কারণে দৃষ্টিহীন বা প্রায় দৃষ্টিহীন, এদের চক্ষুর ওপর অস্ত্রোপচারের পরে আমরা পরীক্ষামূলকভাবে দৃষ্টিগত শিক্ষার প্রক্রিয়াগুলি নিয়ে গবেষণা করতে পারি। এ এক অনন্য সুযোগ। মনে হল যদি যুগপৎ আমরা এই শিশুদের জীবনের মানোন্নয়ন করতে পারি এবং এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর পেতে পারি, সেই সুযোগ ছাড়া উচিৎ নয়। সেই সিদ্ধান্ত থেকেই 'প্রোজেক্ট প্রকাশ'-এর জন্ম। মানবিক এবং বৈজ্ঞানিক, এই দুটি আঙ্গিকই সমান গুরুত্বপূর্ণ— একটা ছাড়া অন্যটা থাকলে, এই প্রকল্প হত খুবই সাদামাটা। এ যদি শুধু বৈজ্ঞানিক একটি প্রকল্প হত, তা হত খুবই অনুর্বর। এটি হত স্রেফ একটি বৌদ্ধিক প্রকল্প, হৃদয়ের ভাগ সেখানে থাকত না।

গর্গ ঃ এতদিন অবধি, প্রোজেক্ট প্রকাশ থেকে প্রাপ্য গবেষণার ফলগুলির মধ্যে কোনটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে তোমার মনে হয়?

পবন ঃ প্রোজেক্টের শুরুতেই যে প্রশ্নটির উত্তর আমাদের অজানা ছিল তা মস্তিষ্কবিজ্ঞানের একটি প্রচলিত ধারণা সম্পর্কিত। এই যে ৮-৯ বছর বা তারও বেশি বয়েসী শিশু-কিশোর-যুবকদের ওপর আমরা অস্ত্রোপচার করছি, এর ফলে কি তাদের দৃষ্টির আদৌ কোনো উন্নতি সাধন হয়? প্রচলিত মতবাদ অনুযায়ী মস্তিষ্ক কিছু কিছু ব্যাপারে

যখন কারুর কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকে, এবং যদি আমরা জানি যে এই প্রতিবন্ধকতা দূর করা সম্ভব— তখন সেইটা একটা মানসিক পীড়ার সৃষ্টি করে।

একটা বয়সের পর আর ব্যাপকভাবে বদলায় না। ফলে বেশ কয়েক বছর দৃষ্টিগত তথ্যধারা মস্তিষ্কে না আসার ফলে দৃষ্টি বিকাশের কলকব্জাগুলি অকেজো হয়ে যায়— ফলে দেরিতে অস্ত্রোপচার করেও কোনো সুফল পাওয়া যায় না। আমাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে আমরা দেখিয়েছি যে ছানির ফলে জন্মান্ধ হলেও মস্তিষ্কের দৃষ্টিগত তথ্য-ধারাকে ব্যবহার করার কলকব্জা সব বিনষ্ট হয় না। অনেক পরেও তাকে সজীব করা যায়। এই শিশুদের জন্য সেই সামান্য উন্নতিই জীবনযাত্রার মানে আনে বিরাট পরিবর্তন। পরীক্ষাটি গবেষণা-পত্রিকা 'সাইকোলজিক্যাল সায়েন্স'-এ

প্রকাশিত হয় এবং বৈজ্ঞানিক জগৎ তথা চিকিৎসা মহলে আলোড়ন পড়ে যায়। টাইমস পত্রিকা, নিউইয়র্ক টাইমস সংবাদপত্রের মতো সংবাদমাধ্যম আমাদের গবেষণা-ফল নিয়ে স্টোরি করে। তার পরে প্রোজেক্ট প্রকাশ থেকে এই ফলের সোপান ধরে এসেছে একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা-ফল। যারা এইসব জিনিস নিয়ে আরও বিশদে জানতে চান, তাদের আমি আমাকে psinha@mit.edu ঠিকানায় ইমেল করতে আহ্বান জানাচ্ছি।

গর্গ ঃ (পাঠকদের জানিয়ে রাখি, এম আই টি-তে বসে বসে নয়, প্রোজেক্ট প্রকাশ-এর এই কাজ চলে দিল্লিকে কেন্দ্র করে, যদিও এর বিস্তৃতি হরিয়ানা, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তর প্রদেশের বিস্তীর্ণ এলাকায়।) তা ভারতে এই ধরনের কাজ করতে কী কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে?

পবন ঃ সমস্যা হয়েছে দুই ধরনের— এক. কর্মগত আর দুই. মনোভাব-কেন্দ্রিক। দূর-দূরান্ত থেকে জন্মগত ছানির ফলে দৃষ্টিহীন শিশু খুঁজে দিল্লি আনা সহজ নয়। আমরা দিল্লিতে বসে থাকলে পারতাম— এই আশায় যে কবে এমন কেউ এসে আমাদের সহযোগী চক্ষু হাসপাতালের (শরফ চ্যারিটি আই হসপিটাল) সাথে যোগাযোগ করবে। এটা প্রায় অসম্ভব, কারণ হয় এই কিশোরদের বাড়ির লোকেদের বলে দেওয়া হয়েছে যে অস্ত্রোপচারে কিছু উন্নতি হওয়ার নয়, কিম্বা তারা এতটাই প্রত্যন্ত এলাকায় থাকেন যে দিল্লির হাসপাতালে পৌঁছনো তাদের সাধ্যাতীত। মোদ্দা কথা হল, এইসব কারণে আমরা সক্রিয়ভাবে গ্রামে গ্রামে যাই, সেখানে চক্ষুশিবির বসাই, এবং নানারকমের দৃষ্টি-দৌর্বল্যে ভোগা কিশোর-কিশোরীদের পরীক্ষা করি, আমাদের বিধিমত খাপে খাপে মেলে, এমন জন্ম থেকে ছানি হওয়া মানুষজন খুঁজে পেতে। ভারতবর্ষ এতই বড়, সেই অনুসারে চক্ষু পরীক্ষক-কর্মি তৈরি করা একটা বিরাট সমস্যা, অন্য সমস্যাটি মনোভাব জনিত। আমাদের দেশে, বিশেষত অনেক গ্রামাঞ্চলে ধারণা আছে যে মানুষ জন্মগত ভাবে দৃষ্টিহীন হয় তাদের বা তাদের মা-বাবার পূর্বজন্মের কর্মফলের কারণে। অনেকক্ষেত্রে মা-বাবারা বলেন যে আমরা নিশ্চয় অভিশপ্ত কোনো কারণে, যার ফলে সন্তানের এই দৃষ্টিহীনতা। এই ধরনের দিব্য কারণে বিশ্বাসের ফলে মা-বাবারা সন্তানকে চিকিৎসা করানোর উৎসাহ অনেক ক্ষেত্রে হারিয়ে ফেলে। এই ধারণায় দৃষ্টিহীনতা কৃতকর্মের জন্য ন্যায্য শাস্তি, ফলে নিজেদের দুঃখ-কষ্টকে তারা ভবিতব্য মনে করে। এমন দিব্য-ঘটিত শাস্তির ফল এড়ানো অসম্ভব— এমনি বিশ্বাস। আমাদের এইসব ক্ষেত্রে অনেক পরিশ্রম করতে হয়, অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে ধারণার পরিবর্তন করতে হয়। কিছু ক্ষেত্রে আমাদের দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখেন তাঁরা। স্বাভাবিক ভাবেই সন্দেহ করেন, আমাদের ধান্দাটা কি— আমরা কেন তাঁদের প্রত্যন্ত গ্রামে বাড়ি বয়ে এসে শহরে নিয়ে গিয়ে তাঁদের সন্তানের বিনামূল্যে চক্ষু অস্ত্রোপচার করতে চাই। তাঁরা হয়তো মনে করেন, আমাদের কোনো দুরভিসন্ধি আছে বা আখের গোছানোর কোনো ব্যবস্থা এটি। এই সকল ক্ষেত্রেই আমাদের প্রাঞ্জল ভাবে পুরো প্রকল্প নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে হয়, বোঝাতে হয়, দেখাতে হয় আগের কাজ, অর্জন করতে বিশ্বাস। কাজটা শক্ত— তাদের সন্দেহ হয়তো স্বাভাবিক। এটা আনন্দের কথা যে বেশ কয়েক বছর এই প্রতিবন্ধকতাগুলি সত্ত্বেও প্রোজেক্ট প্রকাশ যথেষ্ট সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে চলেছে।

(ব্যক্তিগত পরিচয়গুলি রক্ষা করার জন্য শিশুদের নামগুলি বদলে দেওয়া হয়েছে।)

এই লেখাটির একটি সংক্ষিপ্ত অংশ দৈনিক সংবাদপত্র ‘প্রাত্যহিক খবর’-এ প্রকাশিত হয়েছে— সম্পাদক, **স্বাস্থ্যের বৃত্তে**।

লেখক পরিচিতিঃ ডা. গর্গ চট্টোপাধ্যায় কলকাতার মেডিকেল কলেজ থেকে এম বি বি এস পাশ করার পর আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নায়ুবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা ক রে পি এইচ ডি ডিগ্রি লাভ করেছেন; বর্তমানে আমেরিকার ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি-তে মস্তিষ্ক ও মনোবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণারত।

- স্বাস্থ্যের বৃত্তে: চিকিৎসার মানবিক মুখের সন্ধানে চেনা স্বপ্ন, অচেনা পথ
- বাণিজ্যিক নয়— মানবিক
- চিকিৎসা ব্যক্তির অধিকার, সমষ্টির দায়িত্ব

ল্যাপারোস্কোপিক কোলেসিস্টেকটমি বা ল্যাপ কোলে

সার্জেন যেন আদর করেই ছোট্ট মিষ্টি নাম দিয়েছেন 'ল্যাপ কোলে'। পুরো কথাটা একটু খটোমটো— 'ল্যাপারোস্কোপিক কোলেসিস্টেকটমি'। পিত্তথলির রোগে পেটের মধ্যে তিন-চারটে ছোট ফুটো করে সেই ফুটো দিয়ে ভেতরে নল ঢুকিয়ে দেন ডাক্তারেরা। তারপর টিভির পর্দার মতো একটা পর্দায় দেখতে দেখতে কেমন করে যেন ঐ নলের মাধ্যমেই টুক করে কেটে বাদ দেন পিত্তথলি। রোগীর কষ্ট কম, খরচাও যে সবসময় বেশি হবে তা-ও নয়— লিখছেন **ডা. সুজয় বালা ও ডা. অরিজিৎ বাগ**।

ল্যাপারোস্কোপিক কোলেসিস্টেকটমি বা ল্যাপ কোলে কী ও রোগীর পক্ষে কতটা উপযোগী?

এরকম ঘটনার কথা আমরা প্রায় সকলেই শুনি যে পরিচিতদের মধ্যে কেউ হঠাৎ পেটে ব্যথা নিয়ে ডাক্তারবাবুর কাছে গেলেন এবং ডাক্তারবাবু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বললেন যে তার পেটে পিত্তথলি বা গল ব্লাডারে পাথর হয়েছে। আর তার প্রায় সাথে সাথেই বা কয়েকদিনের ব্যবধানে রোগীর ল্যাপারোস্কোপিক কোলেসিস্টেকটমি করে পিত্তথলি কেটে বাদ দিয়ে দেওয়া হল এবং কিছু দিন পর তিনি সুস্থও হয়ে গেলেন। হঠাৎ করে এমন কি হল? কেনই বা এই ল্যাপারোস্কোপিক কোলেসিস্টেকটমি করতে হল? আর করার পর কিভাবেই বা তিনি সুস্থ হয়ে গেলেন? এই পুরো ব্যাপারটাই আমরা সহজ ভাবে আলোচনা করব।

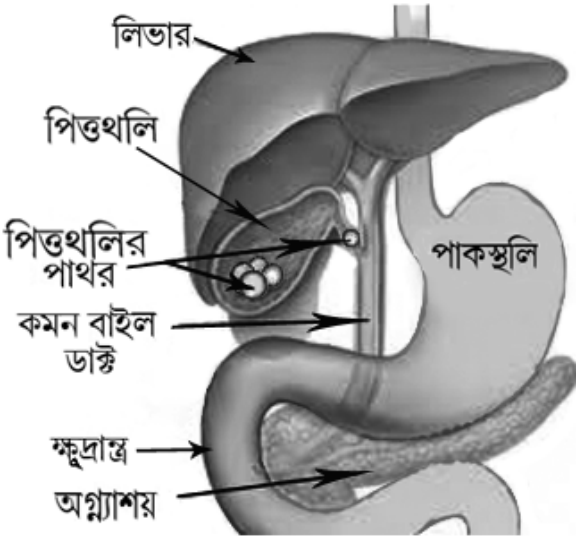

কোলেসিস্টেকটমি কী?

মানুষের শরীর থেকে পিত্তথলি বা গল ব্লাডার কেটে বাদ দেওয়ার পদ্ধতিকে বলা হয় কোলেসিস্টেকটমি। এটি প্রধানত দুভাবে করা যেতে পারে। প্রথমত, ওপেন কোলেসিস্টেকটমি (open cholecystectomy) দ্বিতীয়ত, ল্যাপারোস্কোপিক কোলেসিস্টেকটমি (laparoscopic cholecystectomy)। এই দুটির বিষয়ে আমরা পরে আরও বিস্তারিত আলোচনা করব। তার আগে আমাদের পিত্তথলি বা গল ব্লাডার সম্বন্ধে একটু জানা দরকার।

পিত্তথলি ও পিত্তথলির প্রয়োজনীয়তা

পিত্তথলি মানুষের শরীরের পেটের ভিতর ডানদিকে উপরিভাগে লিভার (liver) বা যকৃতের নিচে অবস্থিত একটি থলি যাতে পিত্ত (bile) জমা হয়। মানুষের দেহে পিত্ত উৎপাদনকারী অঙ্গ যকৃত। সেখান থেকে উৎপাদনের পরে মূলত দুটি নালী (right hepalic duct & left hepalic duct) বেয়ে পিত্ত চলে আসে ঐ দুটি নালীর সংযোগে তৈরি প্রধান (common) নালীতে, তারপর পিত্তথলিতে। এইভাবে যকৃতে উৎপন্ন পিত্ত পিত্তথলিতে জমা হয়। পিত্তথলিতে থাকাকালীন এই পিত্ত আরও ঘন হয়ে ওঠে। পিত্ত মানুষের

> পিত্তথলি এমনিতে কাজের জিনিস, কিন্তু রোগ হলে সেটাকে বাদ দিলে কোনো ক্ষতি হয় না

খাবারের মধ্যে থাকা চর্বিজাতীয় পদার্থ ও চর্বিতে দ্রবীভূত ভিটামিনগুলির শোষণে সাহায্য করে। পিত্তথলির কাজ পিত্ত জমা রাখা ও তাকে আরও ঘন এবং পরিপাকে সহায়ক করে তোলা। পিত্তথলি থেকে বেরোয় পিত্তনালী (cystic duct)। তার সঙ্গে কমন হেপাটিক ডাক্টের সংযোগে তৈরি হয় কমন বাইল ডাক্ট বা নালীর। পিত্তথলিতে জমে থাকা পিত্ত এই নালীর মাধ্যমে খাদ্যনালীতে পৌঁছায় ও খাবারের সাথে মিশে তা শোষণে সাহায্য করে। আমরা যখন চর্বিজাতীয় খাদ্য খাই তখন আমাদের পাকস্থলী ও খাদ্যনালীর অন্যান্য অংশ থেকে নির্গত কিছু স্থানীয় হরমোন পিত্তথলির সংকোচন ঘটায় ও পিত্ত নিঃসরণে সাহায্য করে।

এতক্ষণ আলোচনা থেকে মনে হতে পারে এই পিত্তথলি আমাদের শরীরের একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অঙ্গ। কিন্তু না, একটি মানুষ তার পিত্তথলিটি না থাকলেও যকৃতে তৈরি হওয়া পিত্তের উপর নির্ভর করে সারাজীবন সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকতে পারে। তাই আমাদের শরীরের মধ্যে যখন পিত্তথলি কোনোভাবে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে, তা সে পিত্তথলিতে পাথর (gall bladder stone) বা টিউমার বা অন্য যা কিছুই হোক, তার থেকে যদি মানুষটির ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে তবে পিত্তথলিটি কেটে বাদ দিয়ে চিকিৎসা করা হয়। এতে এই মানুষটির সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে কোনো অসুবিধা হয় না, আবার ভবিষ্যতের ক্ষতি ও কষ্টের হাত থেকেও মুক্তি পাওয়া যায়।

কোলেসিস্টেকটমি কখন করা হয়?

কোলেসিস্টেকটমি করার প্রধান কারণ হচ্ছে অবশ্যই পিত্তথলিতে পাথর হওয়া। অবশ্য সবসময় পিত্তথলিতে পাথর হলেই অপারেশনের প্রয়োজন পড়ে এমনটা নয়। পিত্তথলির পাথর যখন রোগীর দেহে উপসর্গের (symptom) সৃষ্টি করে তখনই অপারেশন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

উপসর্গের ক্ষেত্রে তিনটি জিনিস গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়। প্রথমত পেট ব্যথা—

পিত্তথলির পাথর থেকে প্রধানত পেটের উপরিভাগে ডানদিকে বুকের খাঁচা সংলগ্ন অংশে (right hypochondrium) ও পেটের উপরিভাগে মাঝের অংশে (epigastrium) ব্যথা হতে পারে। এই ব্যথা অল্প থেকে তীব্র পরিমাণে হতে পারে। অনেকক্ষেত্রে ব্যথার সাথে খিদে না থাকা, খাবারে অরুচি বা বমিও হতে পারে। এইসব ক্ষেত্রে পেটে ব্যথা শুরু হবার ৭২ ঘন্টার মধ্যে রোগী যদি ডাক্তারের কাছে হাজির হন ও ঐ সময়ের মধ্যেই যদি পরীক্ষার মাধ্যমে পিত্তথলিতে পাথর ধরা পড়ে তবে সেক্ষেত্রে তৎক্ষণাৎ অপারেশন করে দেওয়া হয়। অন্যথায় রোগীকে সাময়িক ওষুধের সাহায্যে স্থিতিশীল করে চার সপ্তাহ পরে অপারেশন করা হয়।

দ্বিতীয়ত, জ্বর হতে পারে। মধ্যবয়স্ক, স্বাস্থ্যবান মহিলা জ্বর, পেটের উপরিভাগে ডানদিকে ব্যথা ও খাবারে অরুচি ইত্যাদি উপসর্গ নিয়ে হাজির হলে ডাক্তারবাবুরা সবসময়ই পিত্তথলিতে পাথরের কথা মাথায় রাখেন।

তৃতীয়ত, জন্ডিস। পিত্তথলির পাথর পিত্তনালীতে এসে পিত্ত নিঃসরণের পথ বন্ধ করে দিলে জন্ডিস হতে পারে। তবে সেসব ক্ষেত্রেই এর জন্য অপারেশন প্রয়োজন হয় না। এক্ষেত্রে অন্য পদ্ধতিতে চিকিৎসার সুযোগ থাকে ও তা ডাক্তারবাবুর বিবেচনা ও পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল। অন্য পদ্ধতি বলতে ই আর সি পি (ERCP) হল প্রধান। এই বিষয়টি নিয়ে সম্পূর্ণ আলোচনা এখানে করছি না।

এছাড়াও যেসব ক্ষেত্রে পিত্তথলি বাদ দেওয়া হয় সেগুলির মধ্যে অন্যতম পিত্তথলির টিউমার, পোর্সেলিন গল ব্লাডার (এক্ষেত্রে পিত্তথলির গায়ে ক্যালসিয়ামের আস্তরণ পড়ে যায়), ইত্যাদি।

উপসর্গ না থাকলেও অনেক সময় পিত্তথলিতে পাথর থাকলে তা কেটে বাদ দেবার মতো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। যদি রোগী ডায়াবেটিক হন বা শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাসকারী ওষুধ খান সেইসব ক্ষেত্রে, বা পাথরের আকার বড় হলে বা অনেকগুলি ছোট ছোট পাথর থাকলে অনেক সময় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে পিত্তথলি বাদ দেওয়া হতে পারে।

কোলেসিস্টেকটমির পদ্ধতি

প্রথমে বলি ওপেন কোলেসিস্টেকটমির পদ্ধতি সম্বন্ধে। অপারেশনের বিস্তারিত পদ্ধতি যদিও আমাদের আলোচনার ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক তবে এটুকু জেনে রাখা যেতে পারে যে এই পদ্ধতিতে পেটের উপরিভাগে ডানদিকে অনেকটা চামড়া কেটে ও মাংসের আবরণী অনেকটা চিরে সরাসরি চোখে দেখে পিত্তথলিটি কেটে বাদ দেওয়া হয়। এই পদ্ধতির প্রধান অসুবিধা হল—

১. অনেকটা চামড়া ও পেশি কাটার ফলে তাতে

এখন পেটে তিন-চারটে ছোট ফুটো করে নল ঢুকিয়ে পিত্তথলি বাদ দেওয়া যায়— তারই নাম 'ল্যাপ কোলে'।

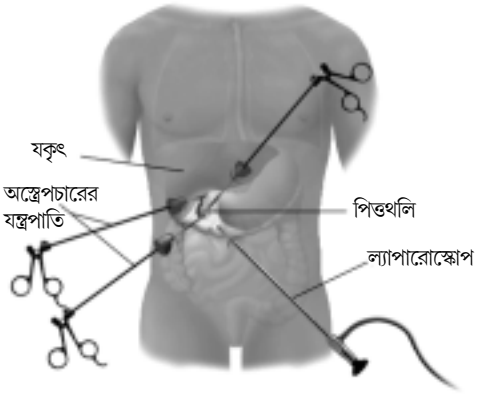

সংক্রমণের সম্ভাবনা বেশি। একবার সংক্রমণ হলে তা ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে ও তা সারতে বেশ সময় লেগে যায়।

২. চামড়া ও তার তলায় মাংসপেশির স্তরের অনেকটা অংশ কাটার ফলে অপারেশন পরবর্তী পর্যায়ে যন্ত্রণা হয় অনেক বেশি।

৩. চামড়া ও পেশির অতটা অংশ জুড়তে বেশি সময় লাগে।

সর্বোপরি এইসব কারণে রোগীকে পুরোপুরি সুস্থ অবস্থায় অর্থাৎ সেলাই কাটার পর বাড়ি যাবার আগে হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে দীর্ঘ সময় থাকতে হয়। এতে রোগীর স্বাভাবিক জীবনে যেতে বেশ দেরি হয়, চিকিৎসার খরচও বাড়ে।

তাই বিগত শতাব্দীর শেষের দিকে চিন্তা-ভাবনা শুরু হয় কিভাবে এই কাটাকুটির পরিমাণ কমিয়ে রোগীকে আরও তাড়াতাড়ি তার স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা যায়। আগে চামড়ায় যে পরিমাণ কেটে অপারেশন করা হত তা কমিয়ে ফেলা হয়। আসে মিনি কোলেসিস্টেকটমি (mini cholecystectomy)। কিন্তু এতেও সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব হয় না, অবশেষে ১৯৮৫ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর জার্মানির Prof. (Dr.) Med Erich Muhe পেটের মধ্যে কয়েকটি নল ঢুকিয়ে তার মধ্যে দিয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি পেটে প্রবেশ করিয়ে পিত্তথলিটি কেটে বার করতে সমর্থ হন। আবিষ্কার হয় ল্যাপারোস্কোপিক কোলে-সিস্টেকটমি।

ল্যাপারোস্কোপিক কোলেসিস্টেকটমিতে প্রকৃত পক্ষে পেটের বিভিন্ন জায়গায় তিন থেকে চারটি ফুটো করা হয়। এরপর ঐ ফুটোগুলি দিয়ে বিভিন্ন সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। যন্ত্রগুলির মধ্যে থাকে ক্যামেরা, শল্যচিকিৎসার কাঁচি, চিমটে, ক্লিপ, ইত্যাদি। এরপর ক্যামেরার সাহায্যে বাইরে মনিটরে দেখে ঐসব যন্ত্রপাতি পেটের মধ্যে সরানো নড়ানো হয় ও শল্যচিকিৎসক চোখে দেখে হাত দিয়ে যেমন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতেন, মনিটরে দেখে নানা কলকব্জার সাহায্যে পেটের মধ্যে রাখা যন্ত্রপাতিগুলোকে সেভাবেই কাজে লাগান। এইভাবে পিত্তথলিটিকে যথাস্থান থেকে কেটে বার করে আনা হয়।

এই পদ্ধতির সুবিধা হল—

প্রথমত যে ডাক্তারবাবু এই অপারেশনটি করছেন তার পক্ষে পিত্তথলিটিকে দেখতে সুবিধা হয়। শুনতে অবাক লাগলেও একথা সত্যি যে পিত্তথলি ক্যামেরার মাধ্যমে অনেক ভালোভাবে দেখা যায় যা পেট কেটে চিরাচরিত ওপেন কোলে-সিস্টেকটমির ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না।

দ্বিতীয়ত, হাসপাতালে এক দিনের বেশি থাকার দরকার হয় না।

তৃতীয়ত, অনেক তাড়াতাড়ি, ৩ থেকে ৭ দিনের মধ্যে, রোগী তাঁর স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারেন।

চতুর্থত, কষ্ট অনেক কম হয়।

'ল্যাপ কোলে' করতে খরচা খুব বেশি নয়, ভোগান্তি কম; পেটের কাটা দাগও তত বড় হয় না। তাই এটাই এখন 'গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড'।

সবশেষে বলা যায় বর্তমানে দুটি পদ্ধতিরই খরচা তুলনীয়। এখন ল্যাপারোস্কোপির যন্ত্রপাতি আগের তুলনায় অনেক বেশি সহজপ্রাপ্য হবার জন্য ও এই পদ্ধতিটি অনেক বেশি প্রয়োগের ফলে দুটি পদ্ধতিতেই মোট খরচের পরিমাণ একই হয়ে যায়।

অবশেষে এ কথা বলতেই হয় যে বর্তমানে এই ল্যাপারোস্কোপিক কোলেসিস্টেকটমিকে কোলেসিস্টেকটমির ক্ষেত্রে সর্বজনগ্রাহ্য পদ্ধতি (gold standard) হিসেবে ধরা হয়। শুধু তাই নয় বর্তমানে অ্যাপেন্ডিক্স কেটে বাদ দেওয়া, হার্নিয়া অপারেশন প্রভৃতি বিভিন্ন শল্যচিকিৎসা ল্যাপারোস্কোপের মাধ্যমে করার প্রবণতা ক্রমবর্ধমান। খরচের দিক থেকে তুলনীয় হওয়ার কারণে যে পদ্ধতিটি রোগীর শরীরের পক্ষে কম কষ্টদায়ক ও স্বাভাবিক জীবনে দ্রুত ফিরে আসার ক্ষেত্রে সহায়ক তা যে সর্বজনগ্রাহ্য হিসেবে বিবেচিত হবে তা বলাই বাহুল্য।

তবু শেষে এ কথাটাও বলে রাখা দরকার যে বিরল কিছু ক্ষেত্রে ল্যাপারোস্কোপিক কোলে-সিস্টেকটমি করা সম্ভব হয় না। সেক্ষেত্রে কিন্তু পুরনো পদ্ধতিতে পেট কেটে অপারেশন করতেই হয়। আর আমাদের দেশে সর্বত্র ল্যাপারোস্কোপ নামক ব্যয়সাপেক্ষ যন্ত্রটি পৌঁছায় নি, আর অনেক শল্যচিকিৎসাবিদ এখনো এই পদ্ধতিতে দক্ষ নন। সেসব ক্ষেত্রেও পেট কেটে অপারেশন ছাড়া গতি নেই।

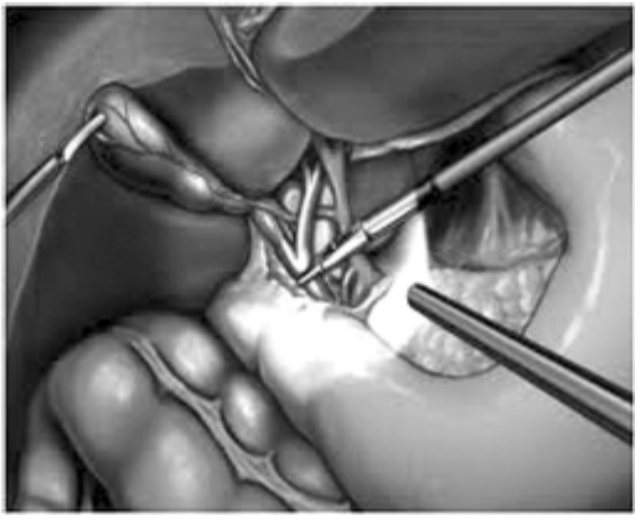

লেখক পরিচিতি : ডা. সুজয় বালা, এম বি বি এস, এম এস, বর্তমানে ক্যান্সার সার্জারিতে উচ্চতর প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন।
ডা. অরিজিৎ বাগ, এম বি বি এস পাস করে শল্য চিকিৎসায় পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি করছেন। দুজনেই হাওড়ার একটি জনমুখী চিকিৎসার ক্লিনিকে যুক্ত।

কুইজ

১. ''সাইনুসাইটিস'' রোগে অনেকেই কষ্ট পান। এই রোগে নাকের দু'পাশের কিছু হাড়ে যে গহ্বর (সাইনাস) থাকে, সেখানে সংক্রমণ ও প্রদাহ হয়। নাকের পাশে মোট ক'জোড়া গহ্বর বা সাইনাস থাকে? কোন্ কোন্ হাড়ের মধ্যে থাকে?

২. তারিখ পেরিয়ে যাওয়া (expired) ওষুধ খেতে নেই এটা সবাই জানে। সাধারণত এইসব ওষুধের গুণাগুণ কমে যায়। কিন্তু কিছু তারিখ পেরানো ওষুধে আবার মারাত্মক প্রতিক্রিয়া হয়— তার মধ্যে একটি হল টেট্রাসাইক্লিন। তারিখ পেরানো টেট্রাসাইক্লিন খেলে যে রোগ হয় তার নাম কি?

৩. ''ইডিয়ট'' কথাটা যদিও গালাগালি হিসেবে ব্যবহৃত হয়, মনোবিজ্ঞানের বুদ্ধি মাপার মাপ কাঠিতে I Q (Intelligence Quotient) কত-র নিচে হলে তাকে ''ইডিয়ট'' বলা যেতে পারে?

৪. গর্ভাবস্থায় কোন্ ওষুধ খাওয়ার ফলে শিশুর হাত-পায়ে সীলমাছের মতো বিকৃতি দেখা যেত বলে ওষুধটি নিষিদ্ধ হয়েছে?

৫. ভাইরাল হেপাটাইটিস রোগটি সবার জানা। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি দেখা যায় হেপাটাইটিস A ভাইরাস জনিত অসুখ। এটি কিভাবে ছড়ায়?

এবারের কুইজটি তৈরি করেছেন **অভিষেক দাস**। বর্তমানে পুনেতে এম বি বি এস পাঠরত।

৬. AIDS রোগীর রক্তসংবহন নালীতে কোন্ টিউমার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে?

৭. শরীরে কোন্ স্নায়ু পরিবাহক যৌগের অভাব পারকিনসন রোগের প্রাথমিক কারণ?

৮. রক্তাল্পতা (অ্যানিমিয়া) বা রক্তে হিমোগ্লোবিনের ঘাটতি শরীরে নানা সমস্যার সৃষ্টি করে। ভারতে প্রধানত কোন মৌলের ঘাটতি জনিত রক্তাল্পতা দেখা যায়?

৯. প্রসবের পরই (১ ঘন্টা) ঘন হালকা হলুদ জলের মতো মাতৃদুগ্ধ নিঃসৃত হয় যা প্রোটিন ও নবজাতকের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয় অন্যান্য পদার্থে ভরপুর। আগেকার দিনে এই দুধ ফেলে দেওয়া হত; এখন শিশুর জন্য এই দুধ আবশ্যিক বলা হয়। এই তরলের নাম কি?

১০. দুধ ও দুগ্ধজাত কোনো খাবার খাওয়ার কয়েক ঘন্টা (সাধারণত ৬ ঘন্টা) পরেই বমি, পেট ব্যথা, পাতলা পায়খানা হলে কোন্ জীবাণুর বিষক্রিয়া বলে সন্দেহ করা হয়?

১১. শিশুর জন্মের পরে ধীরে ধীরে নির্দিষ্ট সময়ে সব বোধ কাজ করতে শুরু করে। কোন্ সময় থেকে স্বাভাবিক শিশু কানে শুনতে পায়?

১২. আখের ছিবড়ে দিয়ে কার্ডবোর্ড ইত্যাদি বানানোর কারখানায় যাঁরা কাজ করেন— এই ছিবড়ের গুঁড়ো, যাতে একটি ছত্রাক থাকে প্রশ্বাসের সঙ্গে তাঁদের ফুসফুসে গিয়ে একটি রোগের সৃষ্টি করে। এই রোগের নাম কি?

১৩. শিশুদের রিউম্যাটিক ফিভার বা গেঁটেবাত একটি বিশেষ ব্যাকটেরিয়ার পূর্ব-সংক্রমণের ফলে হয়। এই ব্যাকটেরিয়ার নাম কি?

১৪. ''রেডক্রশ'' একটি অতি পরিচিত নাম। কে কবে এই আন্তর্জাতিক সংস্থাটি প্রতিষ্ঠা করেন?

১৫. সব সিগারেটের প্যাকেটের গায়ে ক্যান্সার রোধের জন্য ''সিগারেট খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক'' এই বিধিসম্মত সতর্কীকরণ কবে থেকে শুরু হয়েছে?

— উত্তর ৪৯ পাতায়

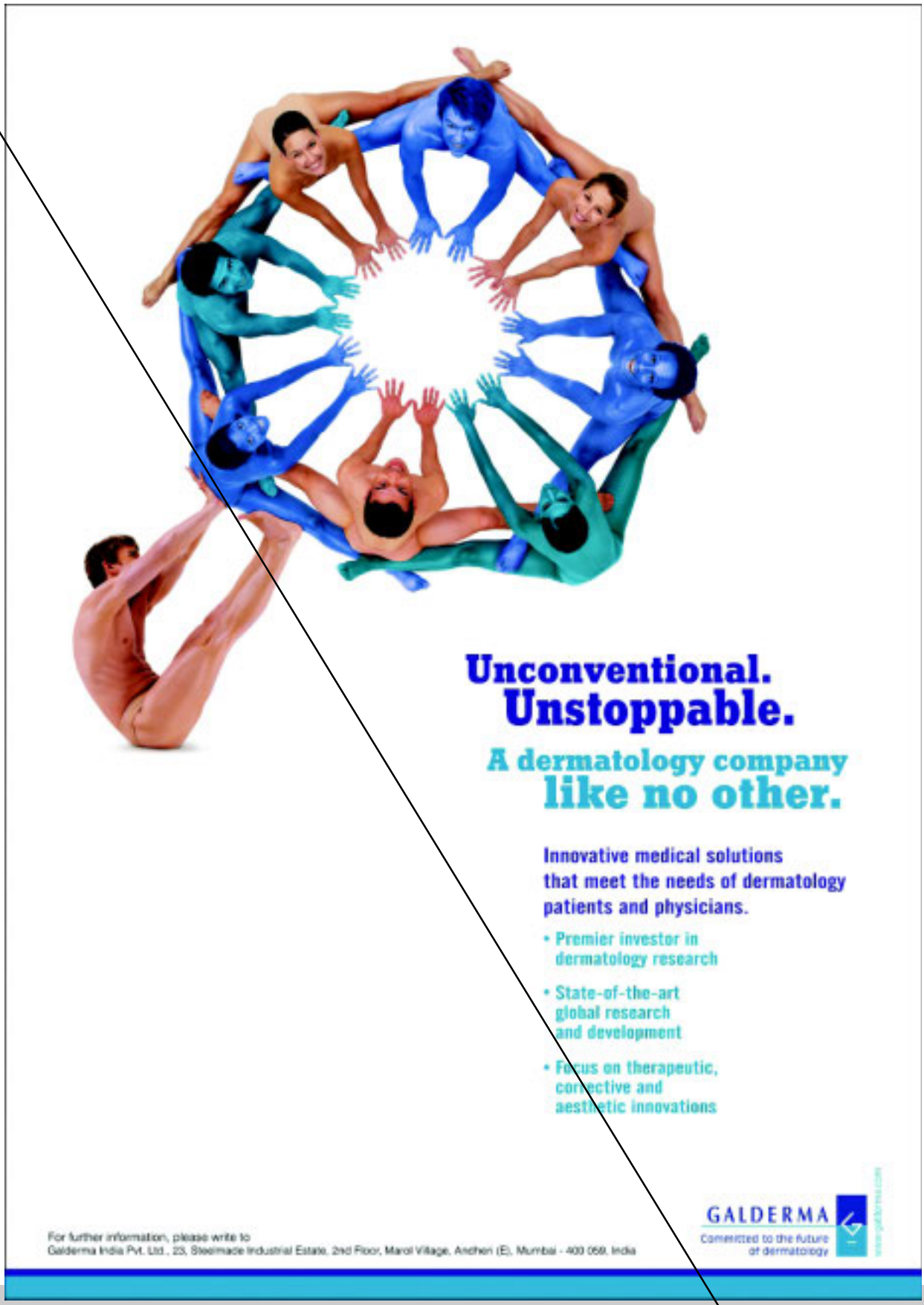
Unconventional.
Unstoppable.
A dermatology company
like no other.
Innovative medical solutions
that meet the needs of dermatology
patients and physicians.
• Premier investor in
dermatology research
• State-of-the-art
global research
and development
• Focus on therapeutic,
corrective and
aesthetic innovations
For further information, please write to
Galderma India Pvt. Ltd., 23, Steelmade Industrial Estate, 2nd Floor, Marol Village, Andheri (E), Mumbai - 400 059, India
GALDERMA
Committed to the future
of dermatology

বাচ্চার চোখের যত্ন নিন

চোট-আঘাত লেগে বাচ্চার চোখের ক্ষতি যাতে না হয় সে ব্যাপারে অভিভাবকরা সতর্ক, তবু দুর্ঘটনা ঘটে। বাচ্চাদের চোখের আর যেসব রোগ হয় সে ব্যাপারে আমাদের ধারণা স্পষ্ট নয়। কিন্তু এইসব রোগে চোখের সমূহ ক্ষতি হতে পারে— অন্ধ হয়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়, অথচ একটু সচেতন থাকলে এদের হাত থেকে বাঁচা সম্ভব —লিখছেন **ডা. চন্দন বারি।**

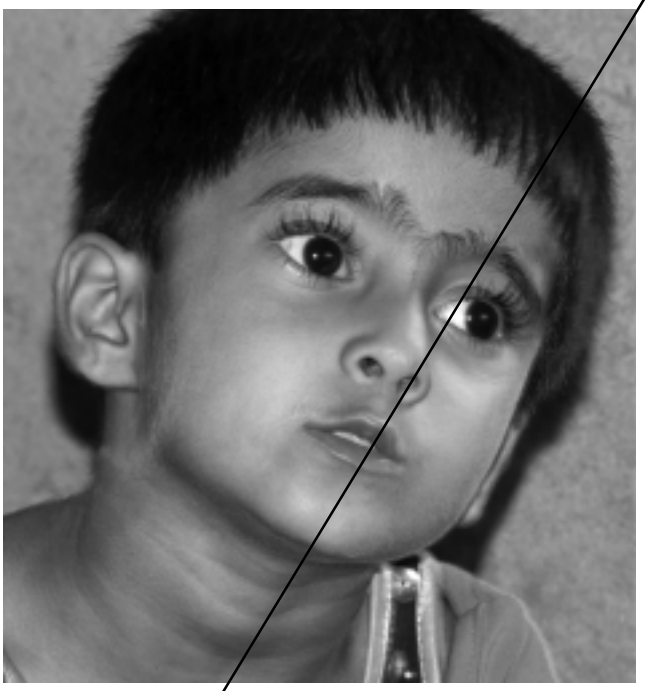

আমার মনে আছে টিভিতে যখন মহাভারত চলছিল তখন একটা খুব দুঃখের ঘটনা নিয়মিত আমাদের হাসপাতালে বসে দেখতে হত। বিভিন্ন বয়েসের বাচ্চারা আমাদের চক্ষুরোগ বিভাগে আসত চোখের নানা চোট নিয়ে। তাদের কারো কারো দৃষ্টিশক্তি চিরকালের মতো নষ্টও হয়ে যেত। মহাভারতের বীরদের মতো বাচ্চারাও নিজের গড়া তীরধনুক তরোয়াল নিয়ে খেলা করতে গিয়ে এরকম দুর্ঘটনা ঘটাত। আরও কয়েক বছর আগে টিভিতে রামায়ণ চলার সময়েও ঐরকম দুঃখজনক ঘটনা ঘটত। আবার প্রতিটি পূজোর সময়, বিশেষ করে কালী পূজোর রাত্রে, চোখে আঘাত নিয়ে আমাদের কাছে বহু বাচ্চা আসে, তাদেরও অনেকের চোখের স্থায়ী ক্ষতি হয়ে যায়। মা-বাবারা অবশ্য প্রত্যেকেই জানেন বাচ্চার হাতে ধারালো অস্ত্র বিপজ্জনক, আগুন বা বাজিও বিপজ্জনক। তাই এই বিষয়টি নিয়ে খুব বিশদে আলোচনা করার দরকার নেই। বরং আজকে আমি বাচ্চাদের চোখের সেইসব সমস্যাগুলো নিয়ে কথা বলব যেগুলোর কিছু কিছু লক্ষণ জানা থাকলে অভিভাবকেরা রোগের প্রথম দশাতেই নিজেরা ব্যবস্থা নিতে পারেন বা চক্ষু-চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যেতে পারেন। একটু সচেতনতা হয়তো আপনার বাচ্চার অমূল্য চোখকে চিরতরে নষ্ট হয়ে যাবার হাত থেকে রক্ষা করতে পারে।

চোখের 'পাওয়ার'

প্রথমে আসি চোখের 'পাওয়ার'-এর কথায়। আজকাল বহু বাচ্চার একদম ছোট বয়সে চোখে ভারি চশমা ওঠে। অভিভাবকরা বলেন 'আমার মেয়ের চোখের পাওয়ার খুব বেড়েছে। এখন তো মাইনাস আট'। কিন্তু ওই 'মাইনাস আট'টা চোখের পাওয়ার নয়, চোখের চশমার তথা কাঁচের লেন্সের পাওয়ার। এর টেকনিক্যাল দিকগুলোতে এখন যাচ্ছি না। শুধু এটুকু বলে রাখি যে আমাদের চোখ অনেকটা ক্যামেরার মতো। আমাদের চোখের কর্নিয়া আর লেন্সের সাহায্যে সামনের কোনো জিনিসের প্রতিবিম্ব আমাদের চোখের মধ্যেকার 'রেটিনা' নামক পর্দায় পড়ে। এটা যদি ঠিকঠাক

> একটু সচেতনতা হয়তো আপনার বাচ্চার অমূল্য চোখকে চিরতরে নষ্ট হয়ে যাবার হাত থেকে রক্ষা করতে পারে

পড়ে তো আমরা জিনিসটা ভালোভাবে দেখতে পাই। ক্যামেরাতে যেমন ফোকাস ঠিক হলে ফিল্মে (বা এখনকার ডিজিট্যাল ক্যামেরার পিছনের স্ক্রিনে) পরিষ্কার ছবি আসে, একদম সেরকম ব্যাপার। এবার ধরুন আপনার চোখে লেন্স বা কর্নিয়া বা উভয়ের সবকিছু ঠিকঠাক নেই, তখন কি হবে? আপনার রেটিনায় প্রতিবিম্ব ভালোভাবে পড়বে না। তখন আপনার দেখতে অসুবিধা হবে। এই অসুবিধা দূর করা যায় আপনার চোখের সামনে কাঁচের লেন্স লাগিয়ে। যাঁরা ক্যামেরা সম্পর্কে একটু ওয়াকিবহাল তাঁরা জানেন যে বেশি দূরের জিনিসের বা খুব কাছের জিনিসের ফটো ভালোভাবে তুলতে গেলে ক্যামেরার নিজস্ব লেন্সের সামনে অতিরিক্ত লেন্স লাগাতে হয়। এটাও সেরকম। আপনার চোখের অনুপাতে লেন্স বা কর্নিয়ার কাজ ঠিকঠাক না হলে আপনাকে হয় কাছের জিনিস দেখতে অসুবিধা হবে— তখন আপনার চোখে প্লাস পাওয়ারের চশমা (অর্থাৎ উত্তল লেন্স) লাগাতে হবে। আর দূরের জিনিস দেখতে অসুবিধা হলে লাগাতে হবে মাইনাস পাওয়ারের চশমা (অর্থাৎ অবতল লেন্স)। আপনার চোখ স্বাভাবিকের চাইতে যত অন্যরকমভাবে প্রতিবিম্ব তৈরি করবে আপনার চোখ তত খারাপ, আপনার চশমার পাওয়ার তাই তত বেশি লাগবে। এটা অবশ্য কিঞ্চিৎ সরল করে বললাম, অনেকের চশমায় খানিকটা উত্তল আর খানিকটা অবতল লেন্স লাগানোর দরকার হতে পারে, আবার সিলিন্ড্রিক্যাল লেন্স ইত্যাদি ব্যাপারও আছে। কিন্তু মা-বাবাদের অতকিছু না জানলেও চলবে, এমনকি এতক্ষণ ধরে যেটা বললাম সেটা বুঝতেই হবে তেমন কথা নেই। তবে বুঝলে সুবিধা হয় এই আর কি।

আপনার বাচ্চার কি চশমা দরকার?

এইবার আসল কথায় আসি। আপনার নিজের ও আপনার প্রতিবেশি বা বন্ধুদের বাচ্চার ওপর নজর রাখুন। আর আপনি যদি বাচ্চাদের স্কুলে মাস্টারমশাই বা দিদিমণি হন তো নজর রাখুন স্কুলের সব বাচ্চার ওপরে। সে কি সামনের বেঞ্চে

বসার জন্য খুব চেষ্টা করছে? মারামারি করছে নাকি বেঞ্চে বসা নিয়ে? তাহলে সেটার কারণ খুব সম্ভবত সে পিছনের বেঞ্চে বসে বোর্ডের লেখা পড়তে পারছে না। তাকে দুষ্টু ভেবে সাজা দেবেন না, বরং তাকে চোখের ডাক্তার দেখানোর ব্যবস্থা করুন। খুব সম্ভব তার 'নিকট দৃষ্টি' বা মায়োপিয়া (myopia) নামক চোখের রোগ হয়েছে। এটা এখন বাচ্চাদের মধ্যে খুব দেখা যাচ্ছে। তার চোখের অনুপাতে লেন্স বা কর্নিয়ার কাজ ঠিকঠাক হচ্ছে না, আমাদের ভাষায় 'রিফ্র্যাক্টিভ এরর' (refractive error)। এই বিশেষ রিফ্র্যাক্টিভ এরর-এর জন্য দূরের জিনিস দেখতে অসুবিধা হচ্ছে, সুতরাং লাগাতে হবে মাইনাস পাওয়ারের চশমা (অর্থাৎ অবতল লেন্স)। চশমা লাগিয়ে সে সব কিছু ঠিকঠাক দেখতে পাবে। চশমাটা সে যেন সবসময় পরে থাকে আর বছরে একবার অন্তত যেন তার পাওয়ার টেস্ট তথা রিফ্র্যাকশন পরীক্ষা করানো হয়।

বাচ্চার 'নিকট দৃষ্টি' বা মায়োপিয়া থাকলে তার আচরণে আরও কিছু বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে। দূরের জিনিস ঠিকমতো দেখতে না পাবার ফলে সে হয়তো বাড়িতে খুব কাছ থেকে টিভি দেখার চেষ্টা করবে, খেলাধুলো করতে অসুবিধা হয় বলেই বই বেশি পড়বে, কিন্তু বই পড়ার সময়ে বইটা মুখের খুব কাছে নিয়ে পড়বে। হয়তো তার একটু পড়াশুনা করলে বা টিভি দেখলে মাথা ধরবে। হয়তো সে পড়ার সময়ে বলবে, 'উফ, কি মাথা ধরেছে'। কিন্তু টিভি দেখতে গিয়ে মাথা ধরার কথা চেপে যাবে, কিন্তু তার চোখ দিয়ে জল পড়বে। সাবধান, সেটাকে নায়ক বা নায়িকার দুঃখে বিগলিত হয়ে যাওয়া বলে ধরে নেবেন না।

আর অল্প ট্যারা হয়ে যাওয়াও চোখের রিফ্র্যাক্টিভ এরর-এর কারণে হতে পারে। প্রথম অবস্থায় এই ট্যারাভাব চশমা (সাধারণত প্লাস পাওয়ার অর্থাৎ উত্তল লেন্স) দিয়ে চিকিৎসা করলে সেরে যায়, তবে দেরি হয়ে গেলে অপারেশান করতে হবে। অপারেশান যদি করতেই হয় তো একদম গড়িমসি করবেন না, কেননা বেশি দেরি হয়ে গেলে অপারেশান করার পরেও চোখের দৃষ্টিও কমজোরি হয়েই থাকবে।

রিফ্র্যাক্টিভ এরর-এ আক্রান্ত বাচ্চার আর একটা অদ্ভুত জিনিস হতে পারে। সে হয়তো একদিন একটা চোখ রগড়াতে গিয়ে লক্ষ্য করল যে অন্য চোখ খোলা থাকা সত্ত্বেও সে প্রায় কিছুই দেখতে পাচ্ছে না বা খুব ঝাপসা দেখছে। ব্যাপারটা কি বলুন তো? তার একটা চোখে রিফ্র্যাক্টিভ এরর খুব বেশি। সাধারণত সেই চোখটা খুব বেশি 'দুরদৃষ্টি' বা হাইপারমেট্রোপিয়ায় আক্রান্ত কিংবা খুব 'নিকট দৃষ্টি' মায়োপিয়ায় আক্রান্ত হয়। ফলে সে সেই চোখ দিয়ে যা দেখে অন্য ভালো চোখ দিয়ে তার চাইতে অন্যরকম দেখে, স্পষ্ট দেখে। খারাপ চোখের তৈরি করা প্রতিবিম্বটি ঝাপসা হয়, আর ভালো চোখ রেটিনায় যে প্রতিবিম্ব তৈরি করে তার চাইতে খারাপ চোখের তৈরি প্রতিবিম্বটি সাইজে অন্যরকম হয়। ফলে তার মস্তিষ্ক দুরকম সাইজের দুটো প্রতিবিম্ব 'দেখে'। একটা স্পষ্ট অন্যটা ঝপসা। এখন মস্তিষ্ক অতি জটিল যন্ত্র, সে দুটো চোখে দুরকম সাইজের প্রতিবিম্ব দেখলে শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে ঠিকঠাক নির্দেশ দিতে পারবে না। তাই তার ক্ষমতা আছে একটা প্রতিবিম্ব বাতিল করে দেবার। সে খারাপ চোখের তৈরি প্রতিবিম্বকে বাতিল করে দেয়, অনবরত বাতিল করতেই থাকে, সেটা রোগী বুঝতেই পারে না। খারাপ চোখের তৈরি প্রতিবিম্ব বহুদিন ধরে বাতিল হতে থাকার ফলে একটা সময়ে মস্তিষ্কের যে অংশ ওই চোখের প্রতিবিম্ব চেতনায় আনে সেই অংশটা অকেজো হতে থাকে। ফলে বাচ্চা ভালো চোখটা রগড়ানোর সময়ে খারাপ চোখ দিয়ে যা দেখে মস্তিষ্ক তাকে চেতনায় আনে না, সেটা মস্তিষ্কে পৌঁছয় বটে কিন্তু আমরা সেটা প্রায় দেখতেই পারিনা। একে বলে অ্যামব্লায়োপিয়া (amblyopia) বা 'কুঁড়ে চোখ' (lazy eye), খারাপ চোখটা অ্যামব্লায়োপিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে। এটা যত বেশিদিন থাকবে চোখের (বা মস্তিষ্কের) এই না-দেখা দশা তত স্থায়ী ও বেশি প্রবল হয়ে যায়। সুতরাং অবিলম্বে চক্ষু বিশেষজ্ঞ দেখান। তিনি চোখের ঠিকঠাক চশমা দেবার সঙ্গে সঙ্গে খুব সম্ভবত ভালো চোখটাকে দিনের মধ্যে কিছুক্ষণ কালো পর্দা দিয়ে বন্ধ করে রাখবেন যাতে বাচ্চা খারাপ চোখটা দিয়ে দেখতে বাধ্য হয়। তখন খারাপ চোখের প্রতিবিম্ব দেখেও তার মস্তিষ্কের যে অংশটা তাকে ধর্তব্যে আনছিল না, সেই অংশটা আবার কাজ করতে শিখবে। যে মস্তিষ্ক-অংশটি প্রতিবিম্ব নিয়ে গণনা করে তাকে আমাদের চেতনায় আনার ক্ষমতাটাই প্রায় হারিয়ে ফেলছিল, আস্তে আস্তে সে ক্ষমতা ফিরে পাবে, ফলে সেই চোখের দৃষ্টিও স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। তবে চশমা পরতে হবে। আর এবারে বোধকরি বুঝতে পারলেন যে আজকাল অনেক বাচ্চাকে কমিকস্ট্রিপের জলদস্যুর মতো এক চোখে কালো 'প্যাচ' আঁটা কিম্ভুত সেজে থাকার রহস্যটা কি। অবশ্য চশমা-পরা জলদস্যুর ছবি আমি দেখিনি, মনে হয় আপনিও দেখেন নি!

কিন্তু দুঃখের বিষয়, যদি চিকিৎসা শুরু করতে দেরি হয়ে যায় তাহলে সে হয়তো সারা জীবন একটা চোখে দেখতেই পাবে না, হাজার চশমা পরেও কিচ্ছু হবে না। তাই আপনার বাচ্চাকে আপনি নিজে পরীক্ষা করে দেখুন। সহজ পরীক্ষা। একচোখ হাত দিয়ে চেপে ধরে দেখুন সে দূরের জিনিস অন্য চোখ দিয়ে কেমন দেখতে পাচ্ছে। এভাবে দুটো চোখই এক এক করে বন্ধ করে দেখুন তার 'একচোখো' দৃষ্টি কেমন। যদি দেখেন সে ডানচোখ বন্ধ করে যেমন দেখছে বাঁ চোখ বন্ধ করেও তেমনই দেখছে তো ঠিক আছে। নইলে অতি অবশ্যই চোখের ডাক্তার দেখান।

ছোট ভুল বড় ক্ষতি

কোনো কোনো বাচ্চার মা-বাবা দেখেন যে জন্মের পর থেকেই তার চোখে পিচুটি জমছে, জল পড়ছে। এটাও অবহেলার বস্তু নয়। অনেকে কাজল লাগিয়ে এটা সারানোর চেষ্টা করেন। সেটা চূড়ান্ত ভুল। কাজল এমনিতেই শিশুর চোখে ব্যবহার করা উচিৎ নয়, এটা একটা ক্ষতিকারক বন্ধ প্রথা। একেবারে ছোট শিশুর চোখে জল পড়া ও পিচুটি সাধারণত নেত্রনালীর সমস্যার জন্য হয়। চিকিৎসকেরা অ্যান্টিবায়োটিক ড্রপ চোখে লাগাতে দিয়ে এর চিকিৎসা করেন। এছাড়া বিশেষ কায়দায় নেত্রনালীর ম্যাসাজ করার দরকার হতে পারে।

এবার আসি চোখ লাল হওয়ার বিষয়ে। দুর্ভাগ্যবশত শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সবাই ধরে নেন চোখ লাল হয়েছে মানেই

কনজাংটিভাইটিস। আর সবাই বলেন, 'ও কিছু নয়, সাতদিনে সেরে যাবে'। কনজাংটিভাইটিস চোখ লাল হবার খুব সাধারণ কারণ ঠিকই, কিন্তু একমাত্র কারণ নয়। বহু গুরুতর রোগে চোখ লাল হতে পারে। কনজাংটিভাইটিসের চোখ লাল হওয়া আর সেসব রোগের লাল হওয়ার মধ্যে কিছু তফাৎ থাকতে পারে, কিন্তু সেটা বোঝা মা-বাবার পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং ডাক্তার দেখান। আর সব কনজাংটিভাইটিস একরকম নয়, তারা সবাই অত 'সাতদিনে সেরে যাবে' মার্কা নিরীহও নয়। যেমন ধরুন ভার্নাল কনজাংটিভাইটিস। এটা সাধারণত বসন্তকালে হয় এবং লম্বা সময় ধরে থাকে। ডাক্তারেরা স্টেরয়েড আইড্রপ দিয়ে এর চিকিৎসা করেন। এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখি। স্টেরয়েড কখনও নিজের বুদ্ধিতে বা ওষুধের দোকানির পরামর্শে ব্যবহার করবেন না। আর আমাদের অনেকের যে বদ অভ্যাস আছে যে একটা

> স্টেরয়েড কখনও নিজের বুদ্ধিতে বা ওষুধের দোকানির পরামর্শে ব্যবহার করবেন না

ওষুধে একবার কাজ হলে বারবার নিজে সেই ওষুধ ব্যবহার করা। কোনো ওষুধের ক্ষেত্রেই সেটা করা উচিৎ নয়। তবে স্টেরয়েড আইড্রপের ক্ষেত্রে এটা মারাত্মক ক্ষতিকর হতে পারে; গ্লকোমা হয়ে দৃষ্টি চিরতরে হারানোও অসম্ভব নয়। প্রসঙ্গত ইতি টানব। একটা হল জন্মগত ছানি [২]। এটা মা-বাবার পক্ষে বোঝা একেবারে অসম্ভব নয়, যদিও কাজটা খুব সহজ নয়। বাচ্চার চোখের দিকে ভালো করে তাকান। ছানিতে তার চোখের মণির ঠিক মাঝখানটায় সাদা মতো দেখা যায়। আপনি অন্যদের চোখের মণির মাঝখানে তাকালে কালো

> ওষুধটির 'এক্সপাইরি ডেট' না হয়ে গেলেও খোলার একমাসের পরে ওষুধটি ফেলে দিন।

আইড্রপের শিশি একবার খোলা হয়ে গেলে তা বেশিদিন ব্যবহার করা উচিৎ নয়। সধারণত শিশি বা টিউবের গায়ে লেখা থাকে খোলার পরে একমাসের মধ্যে ব্যবহার করতে হবে। ওষুধটির 'এক্সপাইরি ডেট' না হয়ে গেলেও খোলার একমাসের পরে ওষুধটি ফেলে দিন।

গ্লকোমার কথা যখন উঠল তখন একটা কথা বলি। জন্মের পরে এক ধরনের জন্মগত গ্লকোমা [১] হয়। বাচ্চা তো কিছু বলতে পারে না, সে চোখে কেমন দেখছে সেটাও বোঝা সম্ভব হয় না। তবে জন্মগত গ্লকোমাতে চোখ দিয়ে জল পড়ে, আর একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে চোখের মণি (কর্নিয়া) অস্বাভাবিক রকমের বড় হয়।

এবার দু-একটা বিরল কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ অসুখের কথা বলে আজকের মতো আলোচনায় ছোটো বৃত্ত দেখবেন, আর এখানে দেখবেন সাদা ছোটো বৃত্ত। এরকম দেখলেই ডাক্তার দেখান। একে বলে হোয়াইট রিফ্লেক্স। হোয়াইট রিফ্লেক্স ছানি ছাড়াও আর একটা গুরুত্বপূর্ণ অসুখেও দেখা যায়— সেটা হল রেটিনোব্লাস্টোমা নামে চোখের এক মারাত্মক টিউমার। রেটিনোব্লাস্টোমা হলে প্রাণসংশয় হতে পারে— এ রোগে চোখ বাদ দিতে হতে পারে, রেডিওথেরাপি বা কেমোথেরাপি লাগতে পারে। আর জন্মগত ছানির ক্ষেত্রে তাড়াতাড়ি রোগ ধরা পড়লে পুরো আরোগ্য সম্ভব— অপারেশান করে চোখের লেন্সের জায়গায় কৃত্রিম লেন্স লাগিয়ে দেওয়া হয়, ঠিক বড়দের ছানি অপারেশানের মতো, তবে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে সাধারণ অবেদন অর্থাৎ জেনারেল অ্যানাস্থেসিয়া করতে হয়।

শেষের কথা

শিশুদের চোখে অজস্র রোগ হতে পারে। তিন-চার পাতা কেন তিন-চারশ পাতা লিখেও সব শেষ করা সম্ভব নয়। তবে মোটের ওপর বেশি দেখা যায় যে রোগগুলি তাদের সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে লিখে আজকের মতো আলোচনা এখানেই শেষ করছি— কেননা এর বেশি লিখলে পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি হতে পারে। পাঠক এই অতি সামান্য কটি কথা মনে রাখলেই দেখবেন জীবনের কোনো না কোনো সময়ে একটি বাচ্চার দৃষ্টি বাঁচাতে পেরেছেন।

- যে বাচ্চা স্কুলে সামনের বেঞ্চে বসার জন্য ব্যস্ত হয়, বা বই পড়ার সময়ে বইটা মুখের খুব কাছে নিয়ে পড়ে, আর একটু পড়াশোনা করলেই বা টিভি দেখলেই যার মাথা ধরে তার চশমা লাগবে কিনা দেখুন।
- সময়ে চশমা না দিলে ট্যারাভাব এসে যেতে পারে, এমনকি একটা চোখের দৃষ্টি কমে যেতে পারে; দেরী হলে কমজোরি চোখ পুরো অন্ধ হয়ে যেতে পারে।
- চোখে পিচুটি পড়লে বা চোখ লাল হলে ও জল পড়লে সেটাকে নিয়ে নিজে ডাক্তারি করবেন না।
- নিজে নিজে চোখের ড্রপ, বিশেষ করে স্টেরয়েড ড্রপ, একেবারেই লাগাবেন না।
- শিশুর গ্লকোমা হতে পারে, এমনকি হতে পারে জন্মগত ছানি। সন্দেহ হলে ডাক্তার দেখাতে দেরি করবেন না।

১. গ্লকোমা নিয়ে আলোচনার জন্য এই সংখ্যায় ''ডাক্তারের ডেস্ক''-এ ডা. সোহম সরকারের উত্তর দেখুন। ২. জন্মগত ছানি নিয়ে আরও আলোচনার জন্য এই সংখ্যায় ডা. গর্গ চ্যাটার্জির ''জন্ম থেকে ছানি নিয়ে গবেষণা— একটি প্রত্যক্ষ বিবরণী'' পড়ুন। সম্পাদক, **স্বাস্থ্যের বৃত্তে**।

লেখক পরিচিতি ঃ ডা. চন্দন বারি, এম বি বি এস, ডি ও, চক্ষুবিশেষজ্ঞ, একটি সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চক্ষুবিভাগে কর্মরত।

With Best Compliments from

SHINE PHARMACEUTICALS LTD.

P-77, Kalindi Housing Estate
Kolkata- 700089

সমস্যা ঃ কোষ্ঠকাঠিন্য

ইংরেজীতে constipation, বাংলায় কোষ্ঠকাঠিন্য, কোষ্ঠবদ্ধতা বা মলবদ্ধতা— সমস্যাটা অনেকের। সমস্যা নিয়ে ভ্রান্ত ধারণাও অনেক; আর সেই ভ্রান্ত ধারণাকে ব্যবহার করে লুঠছে অনেক ওষুধ কোম্পানী। কোষ্ঠকাঠিন্য কেন হয়, কি বা তার যুক্তিসঙ্গত চিকিৎসা— তা নিয়ে লিখছেন **ডা. পুণ্যব্রত গুণ**।

ওষুধ বিজ্ঞানের এক খ্যাতনামা শিক্ষকের কাছে শোনা— কোষ্ঠকাঠিন্য ও মল নরম করার ওষুধ নিয়ে পড়াতে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের তিনি জিজ্ঞেস করেন স্বাভাবিক অবস্থায় একজন মানুষের কতবার মলত্যাগ করা উচিত। কেউ বলে রোজ একবার, কারুর উত্তর দিনে অন্তত দুইবার, কেউ বলল একদিন ছাড়া একবার...। এমনই সব ধারণা ডাক্তারি ছাত্রছাত্রীদের। আসলে সবার উত্তরটাই ঠিক। মলত্যাগের অভ্যাস একেকজন সুস্থ মানুষের ক্ষেত্রে একেক রকম।

কোষ্ঠকাঠিন্য বা কোষ্ঠবদ্ধতা হয়েছে তখন বলা হয় যখন কেউ স্বাভাবিকের চেয়ে কমবার মলত্যাগ করেন, মলত্যাগ করতে যখন কষ্ট হয়, মল যখন শক্ত ও শুকনো।

কোষ্ঠকাঠিন্য কেন হয়?

কোষ্ঠকাঠিন্যের প্রধানতম কারণ হল খাদ্যে তন্তু বা ছিবড়ের অভাব। আমরা যে খাবার খাই পাচক রসে হজম হওয়ার পর তা থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো রক্তে শোষিত হয়, আর বর্জ্য অবশেষ শরীর থেকে বেরোয় মল রূপে। খাদ্যে ছিবড়ের পরিমাণ বেশি হলে মল আয়তনে বাড়ে, শরীর থেকে বেরোয় অনায়াসে।

ছোট বেলায় নিয়মিত মলত্যাগের অভ্যাস তৈরি না হওয়াও কোষ্ঠবদ্ধতার আরেক কারণ।

অনেকে আবার পায়খানা পাচ্ছে অথচ পায়খানা চেপে রাখেন, তা থেকেও কোষ্ঠবদ্ধতা হয়।

বয়স্ক মানুষরা আবার কোষ্ঠকাঠিন্যে ভোগেন যথেষ্ট চলাফেরা করেন না বা করতে পারেন না বলে। তাছাড়া তাঁদের পেটের ও শ্রোণির মাংসপেশি দুর্বল হয়ে যায় বলে পায়খানা করার সময় যথেষ্ট চাপ দিতে পারেন না— ফল কোষ্ঠবদ্ধতা।

অনেক সময় আবার কোষ্ঠবদ্ধতা অন্তর্নিহিত কোন বড় রোগের উপসর্গ। ৪০ বছরের বেশি বয়সি কারুর যদি বেশ কিছুদিন কোষ্ঠবদ্ধতা হতে থাকে অথবা কারুর যদি কোষ্ঠবদ্ধতার সঙ্গে পায়খানার সঙ্গে রক্ত, মলত্যাগের সময় ব্যথা বা ওজন কমে যাওয়ার মত উপসর্গ থাকে তাহলে অন্য রোগের কথা ভাবতে হয়। এসব রোগের মধ্যে আছে অর্শ (piles), পায়ুতে চির (anal fissure), উপদাহী অন্ত্রের লক্ষণসমূহ (irritable bowel syndrome)। উপস্থলীময়তা (diverticulosis) বা ক্যান্সারের কারণে বৃহদন্ত্র সরু হয়ে গেলেও কোষ্ঠকাঠিন্য হতে পারে।

কোষ্ঠকাঠিন্য বা কোষ্ঠবদ্ধতা হয়েছে তখন বলা হয় যখন কেউ স্বাভাবিকের চেয়ে কমবার মলত্যাগ করেন, মলত্যাগ করতে যখন কষ্ট হয়, মল যখন শক্ত ও শুকনো।

কোষ্ঠবদ্ধতা হলে কি করবেন?

একটু আগে যেসব উপসর্গের কথা বললাম, সে রকম কিছু থাকলে যত দ্রুত সম্ভব চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। সেসব না থাকলে নিজেরা চেষ্টা করে দেখা যায়।

আমাদের খাবারে যেসব ছিবড়ে থাকে সেগুলো আসলে সব্জি ও ফলের কোষপ্রাচীর। এদের অধিকাংশটাই স্টার্চ নয় এমন বহু-শর্করা (non-stratch polysacchride), এই ছিবড়ে গুলোর মধ্যে কিছু দ্রাব্য, কিছু অদ্রাব্য। অদ্রাব্য ছিবড়ে অপরিবর্তিতরূপে ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে বৃহদন্ত্রে ঢোকে, আর এদের জল ধারণের ক্ষমতাও অনেক। তাই কোষ্ঠবদ্ধতা হলে বেশি ছিবড়ে যুক্ত খাবার খেতে হবে, যেমন— আচালা (ভূষিশুদ্ধ) আটার রুটি, শাকসব্জি। আর জল খেতে হবে প্রচুর পরিমাণে। প্রয়োজনে এছাড়া ইসবগুলের ভূষিও খাওয়া যেতে পারে।

ডাক্তাররা বিরেচক হিসবে নানা ধরনের ওষুধ ব্যবহার করেন। তাদের মধ্যে কিছু অন্ত্রের ভিতরকার সান্দ্রতা বাড়িয়ে মলকে তরল করে, যেমন—ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্সাইড বা ম্যাগনেসিয়াম সালফেট— এই দুই ধরনের অজৈব লবণ আর ল্যাক্টুলোজ নামের কৃত্রিম দ্বিশর্করা। ডোকুসেট সোডিয়াম, লিকুইড প্যারাফিন মলকে নরম করে। বিসাকোডিল, সোডিয়াম পিকোসালফেট, গ্লিসারল ইত্যাদি আবার বিভিন্নভাবে অন্ত্রের গতি বাড়ায়। তবে এসব ওষুধ ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কখনও খাবেন না।

মল নরম করার ওষুধ (বিরেচক)-এর অপব্যবহার

অনেক সময় গর্ভাবস্থা বা কোন রোগের সময় মল নরম করার ওষুধ খেতে খেতে কেউ কেউ শারীরিক ভাবে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। কেউ আবার ভাবেন রোজ পায়খানা হওয়াই চাই। তাই ওষুধের ব্যবহার বা অপব্যবহার।

উত্তেজক বিরেচকগুলোর ব্যবহারে, বিশেষত বার্ধক্যে শরীরের জল-লবণের ভারসাম্য বিপজ্জনকভাবে বিঘ্নিত হতে পারে।

পায়খানা হচ্ছে না, পেটে ব্যথা, রোগ নির্ণয় হয় নি এরকম অবস্থাতেও বিরেচক বিপজ্জনক।

মলাশয়ে মল শক্ত হয়ে জমে আছে এমন সময় বিরেচক খেলে পায়খানা হবে না বরং কষ্ট বাড়বে। দরকার ডুস দেওয়ার বা ডাক্তার আঙুলে করে শক্ত মল বার করে দেবেন এমন ব্যবস্থার।

লেখক পরিচিতিঃ ডা. পুণ্যব্রত গুণ, এম বি বি এস, জেনেরাল ফিজিশিয়ান, জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের এক কর্মি। বর্তমানে হাওড়ার উলুবেড়িয়া মহকুমায় শ্রমজীবী মানুষের জন্য পরিচালিত এক ক্লিনিকের দায়িত্বে আছেন।

With Best Compliments from

A
Well
Wisher

বিবেকানন্দর অসুস্থতা: কিছু তথ্য, কিছু প্রশ্ন

স্বামী বিবেকানন্দর সার্ধ-শতবর্ষ পূর্ণ হতে চলেছে। মাত্র ৩৯ বছর বয়সে তিনি নানা রোগে ভুগে মারা যান। তাঁর অসুস্থতা, শুশ্রূষা ও চিকিৎসা নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণার বড়ই অভাব— লিখছেন **আশীষ লাহিড়ী**।

অমানুষিক শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের মাশুল দিয়ে মাত্র ৩৯ বছর বয়সে ১৯০২ সালে ডায়াবিটিস, হৃৎরোগ, বাত, অন্ত্রঘটিত রোগ প্রভৃতিতে ভুগে অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে বিবেকানন্দর মৃত্যু হয়। প্রায় সারা জীবনই তিনি নানারকম বড়ো বড়ো অসুখে ভুগেছেন। তার মধ্যে কিছু কিছু অসুখ বহিরাগত সংক্রমণ-জনিত, কিন্তু অধিকাংশই শরীরের আভ্যন্তরীণ মেটাবলিজম-ঘটিত বা অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির অস্বাভাবিক ক্রিয়া-জনিত বলে মনে হয়। আটাশ বছর বয়সে '১৮৯০ তেই ঋষিকেশে তাঁর শরীর খুব খারাপ হয়েছিল, তিনি সংজ্ঞা হারিয়েছিলেন। মৃত্যুর বেশ কাছাকাছি চলে গিয়েছিলেন। পরে এটিকে বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল নির্বিকল্প সমাধি বলে ব্যাখ্যা করেন। এরপর থেকেই স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে পড়েন ও ভ্রমণে আগের মতো ঝুঁকি নেন না।'[১] বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক অসুস্থতা সম্বন্ধে তাঁর স্পর্শকাতরতা এবং অসুস্থতার প্রকোপ উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। ১৮৯৮ থেকে ১৯০২— জীবনের এই শেষ চারটি বছর কেবলই নানারকম রোগের সঙ্গে লড়াই করে কেটেছে তাঁর। অথচ তারই মধ্যে তিনি অবিশ্রান্ত ভ্রমণ করেছেন, বিদেশেও গেছেন। অসুখের পাশাপাশি, অসুস্থতা নিয়ে তাঁর ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে যে-অসুস্থ কোন্দল পেকে উঠেছিল, তার সঙ্গেও যুঝতে হয়েছিল তাঁকে। জীবনের এই শেষ চার বছরের বেদনাদায়ক ইতিহাসটি একটু জানবার ও বোঝবার চেষ্টা করব।

পেশাদার চিকিৎসকদের অনুরোধ করব, এইসব লক্ষণবিচার করে বিবেকানন্দর একটি সম্ভাব্য রোগনির্ণয় যেন তাঁরা করেন। যতদূর জানি, বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে এই রোগনির্ণয়ের প্রয়াস বিশেষ হয়নি। ফলে লোকের মনে নানারকম অলৌকিক ও অবৈজ্ঞানিক ধারণার সঞ্চার ঘটানো সম্ভব হয়েছে (যেমন, যোগসাধনার ফলে তাঁর সারা জীবনের সঞ্চিত বীর্য নাকি মৃত্যুকালে তাঁর ব্রহ্মরন্ধ্র ফুঁড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল!)। এখনো অল্পবয়সীদের এ ধরনের অবৈজ্ঞানিক কথা শেখানো হয়।

'একটি পুরোনো বংশগত রোগ'

১৮৯৮ সালের ২ মার্চ বেলুড় থেকে মিস মেরি হেল্‌কে লেখা চিঠিতে তাঁর শারীরিক অসুস্থতার ছবি তুলে ধরে বিবেকানন্দ লিখছেন:

লন্ডন থেকে ফিরে এসে আমি যখন দক্ষিণ ভারতে, এবং যখন লোকেরা আমাকে উৎসবে ভোজে আপ্যায়িত করছে ও আমার কাছ থেকে ষোল আনা কাজ আদায় করে নিচ্ছে, এমন সময় একটি পুরোনো বংশগত রোগ এসে দেখা দিল।

ওষুধটা কিছু কাজের নয়—

ব্রহ্মজ্ঞানীর শরীরে ঔষধ ধরে না

রোগের প্রবণতা (সম্ভাবনা) সব সময়ই ছিল, এখন অত্যধিক মানসিক পরিশ্রমে তা আত্মপ্রকাশ করল। সঙ্গে সঙ্গে শরীরে এল সম্পূর্ণ ভাঙন ও চূড়ান্ত অবসাদ। আমাকে তৎক্ষণাৎ মান্দ্রাজ ছেড়ে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা উত্তরাঞ্চলে আসতে হল। ... দেখলাম ঠান্ডা আবহাওয়ার মধ্যে আসতে না আসতেই সুস্থ বোধ করি, কিন্তু সমতলের গরমে যেতে না যেতে আবার শয্যাশায়ী হয়ে পড়ি। আজ থেকে কলকাতায় বেজায় গরম পড়েছে, তাই আবার আমাকে পালিয়ে যেতে হবে। ... তুমি আমার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ো না, কারণ রোগটা আর দুই-তিন বছর আমাকে টেনে নিয়ে যাবে। বড় জোর নির্দোষ সঙ্গীর মতো থেকে যেতে পারে।[২]

এই বংশগত রোগটি কি ডায়াবেটিস? লক্ষ্যণীয়, বিবেকানন্দ জানতেন যে তাঁর মধ্যে এই বংশগত রোগের প্রবণতা আছে। ন্যায্যতই তিনি সিদ্ধান্তে আসেন যে অত্যধিক শারীরিক ও মানসিক ধকলে সেই রোগটির প্রকোপ বেড়ে গেছে। তিনি অবশ্য আশাবাদী যে নিরিবিলিতে আরাম করলে এর প্রকোপ কমে আসবে।

কিন্তু ঘটনা অন্য দিকে বাঁক নিল। ঐ চিঠি লেখার মাস দেড়েক পরেই (১৮ এপ্রিল) দার্জিলিং থেকে মিস ম্যাকলাউডকে তিনি লিখছেন যে সেখানেও তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন:

আমি জ্বরে শয্যাগত ছিলাম। সম্ভবতঃ অত্যধিক পর্বতারোহণ এবং এই স্থানের (দার্জিলিঙের) অস্বাস্থ্যকর অবস্থার জন্য এরূপ হয়ে থাকবে। আজ আমি আগের চেয়ে ভাল আছি এবং দু-এক দিনের মধ্যেই এখান থেকে চলে যাবার ইচ্ছা করি। কলকাতায় খুব গরম হলেও সেখানে আমার বেশ ঘুম হত এবং ক্ষুধাও মন্দ হত না। এখানে দুই-ই হারিয়েছি— এই যা লাভ![৩]

অর্থাৎ ঠান্ডা হাওয়াতেও তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতি হল না। সেখানেও জ্বরে ভুগলেন। সঙ্গে দেখা দিল অনিদ্রা আর ক্ষুধামান্দ্য। এবার তিনি দায়ী করলেন দার্জিলিঙের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশকে। পাঁচ দিন পরে (২৩ এপ্রিল) স্বামী ব্রহ্মানন্দকে দার্জিলিং থেকে লিখছেন:

সন্দকফু (Sandukphu, 11,924ft) প্রভৃতি স্থান হইতে আসিয়া অবধি শরীর অতি উত্তম ছিল, কিন্তু পুনরায় দার্জিলিং আসিয়া প্রথম জ্বর, তাহা সারিয়া সর্দি-কাশিতে ভুগিতেছি।[৪]

২৯ এপ্রিল মিস ম্যাকলাউডকে আবার দার্জিলিং থেকে লিখছেন:

আমার অনেক বার জ্বর হয়ে গেল— সর্বশেষ হয়েছিল ইনফ্লুয়েঞ্জা। এখন তা সেরে গেছে বটে, কিন্তু ভয়ানক দুর্বল হয়ে পড়েছি। হাঁটবার উপযুক্ত শক্তি লাভ করলেই আমি কলকাতায় নেমে আসছি। ... কলকাতা এখন নিশ্চয়ই ভয়ানক গরম। তুমি সেজন্য ভেবো না— ইনফ্লুয়েঞ্জার পক্ষে তা ভালোই হবে।[৫]

৩ মে তিনি কলকাতায় 'নেমে' আসেন। সেখানে এক সপ্তাহ থেকেই চলে যান আলমোরা। সেখানে গিয়ে আবার অসুস্থ হন। এবার প্রধান সমস্যা অজীর্ণ ও অনিদ্রা রোগ। ২০ মে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে আলমোরা থেকে লিখছেন:

আমার শরীর অপেক্ষাকৃত ভাল, কিন্তু ডিস্পেপসিয়া যায় নাই এবং পুনর্বার অনিদ্রা আসিয়াছে। তুমি যদি কবিরাজী একটা ভাল ডিস্পেপসিয়ার ঔষধ শীঘ্র পাঠাও তো ভাল হয়।[৬]

১৭ জুলাই স্বামী ব্রহ্মানন্দকে শ্রীনগর থেকে আবার লিখছেন:

আমার শরীর বেশ আছে। রাত্রে প্রায় আর উঠিতে হয় না, অথচ দু-বেলা ভাত আলু চিনি— যা পাই তাই খাই। ওষুধটা কিছু কাজের নয়— ব্রহ্মজ্ঞানীর শরীরে ঔষধ ধরে না। ও হজম হয়ে যাবে—কিছু ভয় নাই।[৭]

দুটো জিনিস নজরে পড়ে। এক, মধুমেহ রোগের দরুণ রাতে তাঁকে অনেক বার 'উঠতে' হত; দুই, তিনি শর্করা জাতীয় জিনিস কম খাওয়া অভ্যেস করেছিলেন। দুটো বিড়ম্বনা থেকেই তিনি আপাতত রেহাই পেয়ে স্বস্তি লাভ করেছেন। ১ অগস্ট শ্রীনগর থেকে জানাচ্ছেন, '*আমার শরীর এক রকম ভালই আছে।*'[৮]

কিন্তু অসুস্থতা-জনিত উদ্বেগের কথা ফিরে এল ১৭ সেপ্টেম্বর। শ্রীনগর থেকে হরিপদ মিত্রকে লিখলেন:

মধ্যে আমার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়ায় কিঞ্চিৎ দেরি হইয়া পড়িল, নতুবা এই সপ্তাহের মধ্যেই পঞ্জাবে যাইবার পরিকল্পনা ছিল। এক্ষণে দেশে অতিশয় গ্রীষ্ম বলিয়া ডাক্তার যাইতে নিষেধ করিতেছেন। ... এখন এক রকম ভাল আছি। ... সম্প্রতি ব্যারামে পড়িয়া বাজে খরচ কিছু হইয়াছে ...।[৯]

হৃদয়-ঘটিত

বারবারই তিনি বলছেন, 'এক রকম' ভালো আছেন। তার মানে, যেকোনো সময় আবার শরীর খারাপ হতে পারে। তার ওপর চিকিৎসার খরচ একটা সমস্যা তৈরি করছে। সেটা একটা বাড়তি দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে। ঐ ১৭ সেপ্টেম্বর তারিখেই খেতরির মহারাজকে টাকা পাঠাবার আবেদন জানিয়ে লিখছেন:

এখানে আমি দু-সপ্তাহ খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। এখন সুস্থ হয়ে উঠেছি। আমার কিছু টাকার টান পড়েছে। যদিও আমেরিকান বন্ধুরা আমাকে সাহায্যের জন্য তাঁদের সাধ্যমত সব কিছুই করেছেন, কিন্তু সব সময়েই তাঁদের কাছে হাত পাততে সঙ্কোচ হয়, বিশেষতঃ অসুখ করলে খরচের বহর অনেক বেড়ে যায়।[১০]

'আমেরিকান বন্ধুদের কাছে' হাত পাতার এই সঙ্কোচের মধ্যে ক্ষীণ আকারে একটা গ্লানিবোধের আভাস রয়েছে। গুরু-শিষ্যের সম্পর্কে এরকম গ্লানির অবকাশ থাকার কথা নয়, কিন্তু বিবেকানন্দ বিবেকবান মানুষ বলেই এই অস্বস্তি। এবং অস্বস্তিটা রীতিমতো বাস্তব। একটু পরেই দেখতে পাব, সমস্যাটা বেশ বড়ো অশান্তির কারণ হয়ে উঠবে।

১৬ অক্টোবর ১৮৯৮ খেতরির মহারাজকে জানাচ্ছেন, '*এ বৎসর কাশ্মীরে অনেক রোগভোগের পর এখন আরোগ্যলাভ করেছি এবং আজ সোজাসুজি কলকাতা যাচ্ছি।*'[১১] একই তারিখে হরিপদ মিত্রকে লিখছেন, '*কাশ্মীরে স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙিয়া গিয়াছে ...।*'[১২] ২৬ অক্টোবর বেলুড় থেকে খেতরির মহারাজকে ও প্রায় একই কথা জানাচ্ছেন— '*আমার খুব ইচ্ছা ছিল নামবার পথে আপনাকে দেখে যাব, কিন্তু আমার স্বাস্থ্য এমনভাবে ভেঙে পড়ল যে একটুও দেরি না করে আমাকে সমতলে ছুটে আসতে হল। ভয় হচ্ছে, আমার হৃদ্‌যন্ত্রে কিছু গোলযোগ হয়েছে।*'[১৩] পরম সুহৃদ খেতরির মহারাজ, যিনি বিবেকানন্দর অসুস্থতার জন্য অর্থসাহায্য করেছেন, তিনি নিজে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, অথচ ত হাঁকে দেখতে না গিয়েই বিবেকানন্দ সমতলে ফিরে এলেন— এটাও বিবেকানন্দর বিবেককে পীড়া দিয়েছে।

দিন কয়েক পর, নভেম্বর মাসে একই ব্যক্তিকে বেশ বিষণ্ণচিত্তে লিখছেন:

... এদিকে আমার হৃদ্‌যন্ত্রটা খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে। বায়ু-পরিবর্তনে আমার আর কোন উপকার হবে বলে মনে হয় না— গত চৌদ্দ বৎসর ধরে আমি এক নাগাড়ে কোথায়ও তিনমাস থেকেছি বলে মনে পড়ে না। মনে হয় যদি বেশ কয়েক মাস কোন এক স্থানে থাকতে পারি, তবেই আমার পক্ষে ভাল হবে। ... যা হোক, আমি বুঝতে পারছি, এ জীবনে আমার কাজ শেষ হয়েছে।[১৪]

ডায়াবেটিস, অজীর্ণ, অনিদ্রা, নানাবিধ জ্বরের সঙ্গে এবার যুক্ত হয়েছে 'হৃদ্‌যন্ত্রের গোলযোগ', যা শেষ পর্যন্ত তাঁর জীবনহানির কারণ হয়ে উঠবে।

১৫ ডিসেম্বর খেতড়ির মহারাজকে আবার লিখছেন, 'আজকাল কিছুটা ভাল আছি। জানি না (স্বাস্থ্যের) এই উন্নতি স্থায়ী হবে, কি না।'[১৫] ভালো-থাকা নিয়ে উদ্বেগ-আশঙ্কা ক্রমে স্থায়ী হয়ে চেপে বসছে তাঁর মনের মধ্যে।

ফুসফুসে কন্‌জেস্‌শন

বস্তুতই তাঁর স্বাস্থ্যের ঐ উন্নতি স্থায়ী হয়নি। ২৯ ডিসেম্বর ১৮৯৮ দেওঘর থেকে শ্রীমতী ওলি বুল ('ধীরামাতা')-কে জানাচ্ছেন:

আপনার সঙ্গে যাবার মতো শারীরিক শক্তি আমি সংগ্রহ করতে পারছি না। বুকে যে সর্দি জমেছিল, তা এখনও আছে, আর তারই ফলে এখন আমি ভ্রমণে অক্ষম। মোটের ওপর আমি ক্রমে সেরে উঠব বলেই আশা করি।[১৬]

হৃদ্‌যন্ত্রের গোলযোগ শুধু নয়, তাঁর ফুসফুসেও ঘটছে সংক্রমণ। প্রায় মৃত্যুর মুখে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। পরে দেওঘরের ঐ অসুখ সম্বন্ধে শিষ্য শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীকে তিনি বলেছিলেন:

... সেখানে এমন হাঁপ ধরল যে প্রাণ যায়। ভেতর থেকে কিন্তু শ্বাসে শ্বাসে ধ্বনি উঠতে লাগলো—'সোহহং, সোহহং'; বালিশে ভর করে প্রাণবায়ু বেরোবার অপেক্ষা করছিলুম ...।[১৭]

২ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৯ বেলুড় থেকে 'স্নেহের জো'-কে লিখছেন:

বৈদ্যনাথে বায়ু-পরিবর্তনে কোন ফল হয় নি। সেখানে আট দিন আট রাত্রি শ্বাসকষ্ট প্রাণ যায় যায়। মৃতকল্প অবস্থায় আমাকে কলকাতায় ফিরিয়ে আনা হয়। এখানে এসে বেঁচে উঠবার লড়াই শুরু করেছি। ডা. সরকার আমার চিকিৎসা করছেন। আগের মতো হতাশ ভাব আর নেই। অদৃষ্টের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছি।[১৮]

অনুমান করতে পারি, ডা. মহেন্দ্রলাল সরকার তাঁর চিকিৎসার ভার নিয়েছেন। তাঁর উদ্বেগ-আশঙ্কাও যেন কিছুটা কমেছে। কিন্তু একই সঙ্গে তিনি 'অদৃষ্টের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে' নিচ্ছেন। বুঝতে পারছেন, তাঁর শরীর পুরোপুরি সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা কম। মাস দেড়েক পরে মিস মেরি হেল্‌কে জানাচ্ছেন, '*আচ্ছা, আমার শরীর এক রকম ভালই যাচ্ছে; তাতে কয়েক মাস যাবৎ মনে হচ্ছে, শরীরটা আরও কিছুকাল টিকবে।*'[১৯] কিছুকালটা যে খুব বেশিকাল নয়, সেই বেদনাদায়ক উপলব্ধি জানিয়ে ১১ এপ্রিল, ১৮৯৯ অজানা প্রাপকের উদ্দেশে

লিখছেন, *' ... দুই বৎসরের শারীরিক কষ্ট আমার বিশ বৎসরের আয়ু হরণ করেছে।*[২০]

ইংল্যান্ডে চিকিৎসা

এর অল্পকাল পর, ২০ জুন ১৮৯৯ তিনি জাহাজে করে ইংল্যান্ড রওনা হন। ৩১ জুলাই লন্ডনে পৌঁছে দুসপ্তাহ উইম্বল্ডনে থেকে আমেরিকা যাত্রা করেন। লন্ডনের পথে জাহাজে তাঁর 'বেশ কিছু স্বাস্থোন্নতি' হয়। প্রায় নাটকীয় সেই পরিবর্তন। ৩ অগস্ট উইম্বল্ডন থেকে লিখছেন:

তা ঘটেছে ডাম্বেল নিয়ে ব্যায়াম ও মৌসুমী ঝড়ে ঢেউয়ের উপর স্টীমারের ওলটপালট থেকে। অদ্ভুত, নয় কি? আশা করি এটা বজায় থাকবে। ... দেখো, এবারের সমুদ্রযাত্রার ফলে আমার বয়স যেন কয়েক বছর কমে গেছে। শুধু যখন বুক ধড়ফড় করে ওঠে, তখন টের পাই বয়স হয়েছে। এটা কি অস্থিচিকিৎসার কোন ব্যাপার? [২১]

সাঁইত্রিশ বছরের যুবক বিবেকানন্দ বুক ধড়ফড় করলে টের পান যে তাঁর বয়স হয়েছে! প্রকাশভঙ্গির উচ্ছ্বাস সত্ত্বেও বেরিয়ে পড়ে তাঁর মনের উদ্বেগ। তিনি এখন অস্থি-ঘটিত সমস্যার কথাও ভাবতে আরম্ভ করেছেন। সত্যিই তাঁর শরীরের এই উন্নতি বেশিদিন টেঁকেনি। ঐ চিঠি লেখার মাত্র কয়েক দিন পর নিবেদিতার বাড়ি থেকে লেখা একটি চিঠিতেও শরীর সম্বন্ধে তাঁর দুশ্চিন্তার খবর পাই:

'বন্ধুরা প্রায় সকলেই লন্ডনের পল্লী অঞ্চলে কিংবা অন্যত্র চলে গিয়েছেন, আর আমার শরীরও বিশেষ সবল নয়।[২২]

অগস্টের দশ তারিখে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লেখেন: *আমার শরীর জাহাজে অনেক ভাল ছিল, কিন্তু ডাঙায় আসিয়া পেটে বায়ু হওয়ায় একটু খারাপ। একজন বড় ডাক্তার বললে, নিরামিষ খাও, আর ডাল ছুঁয়ো না। এঁর মতে ইউরিক এসিড-গোলমালে যত ব্যারাম হয়। মাংস এবং ডাল ইউরিক এসিড বাড়ায়; অতএব 'ত্যাজ্যং ব্রহ্মপদং' ইত্যাদি। যা হোক, আমি তাকে সেলাম করে চলে এলাম। Examine করে বললে চিনি-ফিনি নেই— অ্যালবুমেন আছে। যাক! নাড়ী খুব জোর, বুকটাও দুর্বল বটে। মন্দ কি, দিন কতক হবিষ্যাশী হওয়া ভাল। এখানে বড় গোলযোগ— বন্ধু-বান্ধব সব গরমির দিনে বাইরে গেছে। তার উপর শরীর তত ভাল নয়— খাওয়া-দাওয়ায়ও গোলমাল।* [২৩]

> *শ্রীমতী— আমাকে একবার রাতের খাবার খাইয়েছিলেন, তাঁর বাড়িতে একরাত থাকতে দিয়েছিলেন আর তার পরদিন কেলে বর্বরটাকে নিয়ে সমালোচনা করেছিলেন।*

এই চিঠিতে কিছু সুনির্দিষ্ট তথ্যের উল্লেখ আছে। এর মধ্যে সবচেয়ে দুঃখের হল ঐ 'খাওয়া-দাওয়ায়ও গোলমাল' কথাটি। এর তাৎপর্য, শরীরের ঐরকম অবস্থায় যে ধরনের পথ্য তাঁর পাওয়া উচিত, তা তিনি পাননি। একটু পরেই দেখব, এ নিয়ে অত্যন্ত তিক্ত মন্তব্য করেছিলেন তিনি।

কৌপীনধারণ, বাত ও ডায়াবেটিস

এই নাছোড়বান্দা অসুস্থতা নিয়ে কিছু দুঃখজনক অবাঞ্ছিত বিতর্ক জেগে ওঠে। ১৮৯৯ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর ব্রিটিশ ভক্ত ই টি স্টার্ডিকে লেখা একটি চিঠি থেকে জানতে পারি, এ নিয়ে তাঁর বিদেশি ভক্ত ও গুণগ্রাহী মহলে প্রশ্ন উঠেছিল:

মিসেস জন্‌সনের মতে ধার্মিক ব্যক্তির রোগ হওয়া উচিত নয়। এখন আবার তাঁর মনে হচ্ছে, আমার ধূমপানাদিও পাপ। মিস মূলারও আমায় ছেড়ে গেছেন— ঐ রোগের জন্য। হয়তো তাঁরাই ঠিক। তুমিও জানো, আমিও জানি, আমি যা, আমি তাই। [২৪]

বিবেকানন্দের উদ্বেগ ও বিষন্নতায় একটু যেন বিরক্তির ছোঁয়া লাগছে। স্মরণ করা যায়, স্টার্ডি ও মিসেস জনসন ছিলেন বিলেতে তাঁর বেদান্ত প্রচারের সহায়। স্টার্ডি তাঁর শিষ্যত্ব নিয়ে ভারতে চলে আসেন এবং আলমোরায় নিজে অত্যন্ত কঠিন তপশ্চর্যায় রত হন। ঐ একই চিঠিতে বিবেকানন্দ নিজের শারীরিক অবস্থা সম্বন্ধে অদ্ভুত কিছু মন্তব্য করেন। প্রথম আমেরিকা সফর শেষে যখন তিনি দেশে ফিরে আসেন,

In India the moment I landed, they made me shave my head, and wear 'Kaupin' (loin cloth), with the result that I got diabetes, etc. Saradananda never gave up his underwear - this saved his life, with just a touch of rheumatism and comment from our people.[25] (বাঁকা অক্ষর লেখক কর্তৃক যোজিত)

(ভাবানুবাদ : *ভারতের মাটিতের পদার্পণ করা মাত্র ওরা আমাকে মাথা কামাতে বাধ্য করল, কৌপীন পরতে বাধ্য করল, ফলে আমার হল ডায়াবেটিস প্রভৃতি রোগ। সারদানন্দ কিন্তু কখনোই আন্ডারওয়্যার ত্যাগ করেনি, ফলে তার প্রাণ বেঁচে গেল, বাতের সামান্য প্রকোপ আর আমাদের লোকজনের কানাকানি ছাড়া আর কোনো ভোগান্তি তার হয়নি।*)

আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, বাঁকা ইংরেজি হরফে মুদ্রিত ওপরের অংশটুকু স্বামী বিবেকানন্দের বাংলা রচনাবলী থেকে বিনা মন্তব্যে বাদ দেওয়া হয়েছে। (দ্রষ্টব্য পত্র সংখ্যা ৪২২, *স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা*, ৮ঃ ৬৫, ১৯৬২ সংস্করণ, উদ্বোধন)।

এই 'ওরা' কারা? চিঠির প্রসঙ্গ বিচার করলে মনে হয় এঁরা তাঁর এদেশি ভক্তবৃন্দ। 'ওরা' তাঁকে মস্তকমুণ্ডনে বাধ্য করেছিল, 'ওরা' তাঁকে কৌপীন পরতে বাধ্য করেছিল! কৌপীন পরে ব্রহ্মচর্য সাধনার প্রকরণগত খুঁটিনাটি নিয়ে কোনো মন্তব্য সম্বন্ধে আমরা অনধিকারী। কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করতেন বিবেকানন্দ, যার প্রধান অঙ্গ ছিল যেকোনো মূল্যে বীর্যপাত রোধ করা। 'উর্ধ্বরেতা' হলে তবেই সিদ্ধি আসে, যোগসাধনায় এটা বহুস্বীকৃত। কোনোভাবে কি সেই সাধনার কঠোরতার সঙ্গে যুক্ত সমস্যাটি? বিলেত থেকে ফিরে *বিনা অন্তর্বাসে* কৌপীন ধারণের *ফলে* তাঁর *ডায়াবেটিস* হয়েছিল, এবং অন্তর্বাস পরার বিলিতি অভ্যেস ত্যাগ না করার *ফলে* সারদানন্দকে সে-রোগে ভুগতে হয়নি, এ কথারই বা তাৎপর্য কি? বছর দুয়েক আগেই কিন্তু মেরি হেল্‌কে লেখা পত্রটিতে তিনি *পুরোনো বংশগত রোগের* প্রবণতার উল্লেখ করেছেন। সেটি ডায়াবেটিস হওয়া অসম্ভব নয়। অত্যধিক দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রম সেই পুরোনো বংশগত রোগের প্রকোপকে এতটাই বাড়িয়ে তুলেছিল যে 'শরীরে এল সম্পূর্ণ ভাঙন ও চূড়ান্ত অবসাদ। তাঁকে তৎক্ষণাৎ মান্দ্রাজ ছেড়ে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা উত্তরাঞ্চলে' চলে যেতে হয়েছিল। এর সঙ্গে কৌপীনবন্ত হওয়া বা না-হওয়ার সম্পর্ক আমাদের কাছে স্পষ্ট হয় না। এখানে অবশ্য তাঁর ইঙ্গিত এই যে অন্যদের মন রাখতে গিয়েই বারবার তাঁকে এই ধরনের বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে। বুঝতে পারি, একদিকে ক্রমাগত অসুস্থতা ও তৎ-জনিত উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, অন্যদিকে তাঁর তথাকথিত 'বিলাসী' জীবন নিয়ে তাঁর কাছের মানুষদের মধ্যে যে-ভয়ানক সমালোচনা জেগে উঠেছিল, তা তাঁকে অত্যন্ত মর্মাহত করেছিল। নইলে লন্ডনে স্টার্ডির বাড়িতে আলুভাতে, ডালসেদ্ধ, বাঁধাকপি সেদ্ধ আর ভাত ছাড়া আর কিছু খেতে পাননি বলে অনুযোগ করবেন কেন তিনি? লন্ডনের ডাক্তার তাঁকে ডাল খেতে নিষেধ করেছিলেন, কথাটা মনে রাখতে হবে।

আশ্চর্যের ব্যাপার, বিবেকানন্দর এই অনুযোগের অংশটুকুও উদ্বোধনের বাংলা সংস্করণ থেকে বিনা মন্তব্যে বাদ দেওয়া হয়েছে। বাদ-দেওয়া অংশটুকু মর্মস্পর্শী, মর্মন্তুদও বটে—

I remember your place at Reading, where I was fed with boiled cabbage and potatoes and boiled rice and boiled lentils, three times a day, with your wife's curses for sauce all the time. I do not remember your giving me any cigar to smoke — shilling or penny ones. Nor do I remember myself as complaining of either the food or your wife's incessant curses, though I lived like a thief, shaking through fear all the time, and working every day for you.

The next memory is of the house on St. George's Road — you and Miss Müller at the head. My poor brother was ill there and ... drove him away. There, too, I don't remember to have had any luxuries as to food or drink or bed or even *the room given to me.*

The next was Miss Müller's place. Though she has been very kind to me, I was living on nuts and fruits. The next memory is that of the black hole of London where I had to work almost day and night and cook the meals oft-times for five or six, and most nights with a bite of bread and butter.

I remember Mrs. — giving me a dinner and a night's lodging in her place, and then the next day criticizing the black savage — so dirty and smoking all over the house.[26] (বাঁকা হরফ মূলেই আছে)

(ভাবানুবাদ ঃ রিডিংয়ে তোমার বাড়ির কথা আমার মনে আছে। সেখানে আমায় দিনে তিনবার করে বাঁধাকপি সেদ্ধ, আলুভাতে আর ডালসেদ্ধ গেলানো হত। সেইসঙ্গে ফোড়ন হিসেবে থাকত অষ্টপ্রহর তোমার স্ত্রীর বাক্যবাণ। তুমি আমাকে কোনোদিন একটা চুরুট খাইয়েছিলে বলে তো আমার মনে পড়ে না— তা সে শিলিং দামেরই হোক, আর পেনি দামেরই হোক। খাবার নিয়ে কিংবা তোমার স্ত্রীর অবিরাম বাক্যবাণ নিয়ে কখনো অনুযোগ করেছি বলেও আমার মনে পড়ে না। অথচ আমি *চোরের মতো থাকতুম,* সারাক্ষণ ভয়ে কাঁপতুম, আর প্রতিদিন তোমাদের জন্য কাজ করতুম। পরের স্মৃতিটা সেন্ট জর্জেস রোডের বাড়িটাকে নিয়ে— যেখানে পরিচালনায় ছিলে তুমি আর মিস মূলার। আমার ভাই বেচারী সেখানে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল আর ... তাঁকে বার করে দিয়েছিল। কই, সেখানেও তো খাদ্য বা পানীয় বা শোবার বিছানার কোনো বোলবোলাও ছিল বলে মনে পড়ে না, *এমনকি আমাকে যে-ঘরে থাকতে দেওয়া হয়েছিল,* সেখানাও তথৈবচ। এর পর ছিলুম মিস মূলারের বাড়িতে। তিনি আমার প্রতি খুব সদয় ছিলেন ঠিকই, তবে আমাকে জীবন ধারণ করতে হত বাদাম আর ফল খেয়ে। এর পরের স্মৃতিটা লন্ডনের এক অন্ধকার ঘুপচি গর্তের। সেখানে প্রায় দিনরাত জেগে আমায় কাজ করতে হত, অনেক সময়েই পাঁচ-ছ জনের রান্নাও করতে হত। বেশির ভাগ দিনই রাত্তিরে জুটত এক টুকরো রুটি-মাখন।

মনে আছে, শ্রীমতী— আমাকে একবার রাতের খাবার খাইয়েছিলেন, তাঁর বাড়িতে একরাত থাকতে দিয়েছিলেন আর তার পরদিন কেলে বর্বরটাকে নিয়ে সমালোচনা করেছিলেন, লোকটা নাকি যাচ্ছেতাই নোংরা আর সারা বাড়িতে ধূমপান করে বেড়ায়।) প্রায় যেন বিলাপের মতো শোনায় তাঁর এই বিবরণ। তাঁর শেষ জীবন যে কতখানি তিক্ততার মধ্যে কেটেছিল, তা কিছুটা অনুমান করতে পারি। সেইসঙ্গে বুঝতে পারি, উদ্বেগ-আশঙ্কার সঙ্গে তিক্ত খিটখিটে ভাব (ইরিটেশন) তাঁর মনকে অধিকার করে রেখেছিল।

শেষ পর্ব

Mrs. — giving me a dinner and a night's lodging in her place, and then the next day criticizing the black savage

ইংল্যান্ড থেকে ১৮৯৯ সালের অগস্ট মাসে তিনি আমেরিকা যান। সেখান থেকে ২ মে, ১৯০০ নিবেদিতাকে লিখছেন: *'কঠোর পরিশ্রমের ফলে আবার রোগের আক্রমণ হয়েছিল। যাই হোক, এতে আমি এইটুকু বুঝতে পেরেছি যে, আমার হার্ট বা কিডনিতে কোন রোগ নেই।'*[২৭] এই নির্ণয় সম্ভবত ঠিক ছিল না।

১৯০০ সালের ডিসেম্বরে তিনি বেলুড়ে ফিরে আসেন। আবার ২৯ ডিসেম্বর রওনা হয়ে যান মায়াবতীর পথে। সেখান থেকে বেলুড়ে ফিরে

আমি বুঝতে পারছি,
এ জীবনে আমার কাজ শেষ হয়েছে

আসেন ২৪ জানুয়ারি, ১৯০১। ১৯ মার্চ ঢাকা, আসাম, শিলং ঘুরে বেলুড় ফিরে আসেন মে মাসে। ঐ মাসের শেষ ভাগে শিষ্য শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী লিখছেন:

'স্বামীজী কয়েকদিন হইল পূর্ববঙ্গ ও আসাম হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। শরীর অসুস্থ, পা ফুলিয়াছে।' কেমন আছেন, এই প্রশ্নের উত্তরে তাঁর কণ্ঠে স্পষ্ট হতাশার সুর ফুটে ওঠে:

আর বাবা, থাকাথাকি কি? দেহ তো দিন দিন অচল হচ্ছে। বাঙলাদেশে এসে শরীর ধারণ করতে হয়েছে, শরীরে রোগ লেগেই আছে। এদেশের physique একেবারে ভাল নয়। বেশী কাজ করতে গেলেই শরীর বয় না।[২৮]

শিলং পাহাড়ে গিয়ে তিনি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। *' ... আমার জ্বর, হাঁপানি ও এলবুমেন বেড়েছিল এবং শরীর দ্বিগুণ ফুলে গিয়েছিল। '*[২৯] *ব্রিটিশ হাই কমিশনার কটন সাহেব আমার অসুখ শুনে সরকারী ডাক্তার পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। দুবেলা আমার খবর নিতেন। সেখানে বেশী লেকচার-ফেকচার করতে পারিনি; শরীর বড় অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। রাস্তায় নিতাই খুব সেবা করেছিল।*[৩০]

এই ইডিমা প্রায় নিশ্চিত ভাবেই কিডনির অসুখজনিত। অনেক ক্ষেত্রেই কিডনির এই অবস্থার সঙ্গে হৃৎপিণ্ডের সমস্যাও জড়িত থাকে। এ অসুস্থতা একটানা চলেছে। ১৯০১-এর জুন মাসেও 'শিষ্য' বেলুড়ে এসে দেখেন, 'তাঁহার পা ফুলিয়াছে, সমস্ত শরীরেই জলসঞ্চার হইয়াছে; ... স্বামীজী কবিরাজী ঔষধ খাইতে স্বীকৃত হইয়াছেন। আগামী মঙ্গলবার হইতে নুন ও জল বন্ধ করিয়া 'বাঁধা' ঔষধ খাইতে হইবে।'[৩১]

সম্ভবত ঐ মাসেই শিষ্য জানাচ্ছেন, 'জলপান একেবারে নিষিদ্ধ। দুগ্ধমাত্র পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ

করিতে হইতেছে।' ওষুধে বিশেষ কাজ বোধহয় হয়নি; কারণ শিষ্যের প্রশ্নের উত্তরে বিবেকানন্দ বলেন, 'উপকার-অপকার জানিনে । গুরুভাইদের আজ্ঞাপালন করে যাচ্ছি।' কবিরাজী ওষুধই ভারতীয়দের শরীরের পক্ষে উপযোগী, শিষ্যের এই মত শুনে তিনি তাঁর সেই বিখ্যাত মন্তব্যটি করেন:

আমার মত কিন্তু একজন scientific চিকিৎসকের হাতে মরাও ভাল; layman যারা বর্তমান science-এর কিছুই জানে না, কেবল সেকেলে পাঁজিপুঁথির দোহাই দিয়ে অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ছে, তারা যদি দু-চারটে রোগী আরাম করেও থাকে, তবু তাদের হাতে আরোগ্যলাভ আশা করা কিছু নয়। [৩২] এ কথার গূঢ়ার্থ কী? অন্ধকারে ঢিল-ছোঁড়া layman-রাই কি বিবেকানন্দের কঠিন অসুখের চিকিৎসার ভার নিয়েছিলেন? এ চিকিৎসার ফল নিয়ে বেশ পরস্পরবিরোধী মন্তব্য পাওয়া যাচ্ছে। যেমন, শিষ্য জানাচ্ছেন, 'কবিরাজী অসুখে অনেক উপকার হইয়াছে। মাসাধিক শুধু দুগ্ধপান পান করিয়া থাকায় স্বামীজীর শরীরে আজকাল যেন চন্দ্রকান্তি ফুটিয়া বাহির হইতেছে এবং তাঁহার সুবিশাল নয়নের জ্যোতি অধিকতর বর্ধিত হইয়াছে।' আবার তার পরদিনই লিখছেন, 'শরীর তত সুস্থ নহে; তবে সকালে সন্ধ্যায় বেড়াইতে বাহির হন।' বিবেকানন্দ নিজেও বলেন:

'এ শরীরের তো এই অবস্থা! ... এ শরীর দিয়ে কি আর বেশি কাজ-কর্ম চলতে পারে?' [৩৩]

আমার মত কিন্তু একজন scientific চিকিৎসকের হাতে মরাও ভাল; layman যারা বর্তমান sciencé-এর কিছুই জানে না, কেবল সেকেলে পাঁজিপুঁথির দোহাই দিয়ে অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ছে, তারা যদি দু-চারটে রোগী আরাম করেও থাকে, তবু তাদের হাতে আরোগ্যলাভ আশা করা কিছু নয়।

১৯০২ সালের মার্চ মাসের বিবরণেও দেখি ইডিমা কমেনি। 'উপর হইতে নামিতে পারেন না, চলিতে পারেন না, পা ফুলিয়াছে। ডাক্তারেরা বেশি কথাবার্তা বলিতে নিষেধ করিয়াছেন।' শিষ্যকে বলেন, *'পা ভারি টাটিয়েছে।'* [৩৪] স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লেখা ২৯ এপ্রিল-এর চিঠিতে বিবেকানন্দ নিজে জানাচ্ছেন:

লোকে বলে, আমি বেশ আছি; এখনও বড় দুর্বল, আর জল-পান একেবারে নিষিদ্ধ। তবে এইটুকু হয়েছে যে, রাসায়নিক বিশ্লেষণে অনেকটা উন্নতি দেখা গেছে। পায়ের ফোলা প্রভৃতি একেবারে গেছে।[৩৫]

কিন্তু এ উন্নতি অল্পস্থায়ী হয়েছিল। মাস দিনেক পর, তাঁর প্রিয় আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস ৪ জুলাই ১৯০২-এ তাহর মৃত্যু হয়।

কোনো অলৌকিক লীলা-ঘটিত ব্যাখ্যা যেহেতু বিজ্ঞানমনস্ক আধুনিক মানুষের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়, তাই শেষ পর্যন্ত প্রশ্নটা থেকেই যায়: বিবেকানন্দর কী হয়েছিল যার জন্য মাত্র ৩৯ বছর বয়সে তাঁকে চলে যেতে হল? কী ধরনের চিকিৎসা তিনি পেয়েছিলেন?

সূত্রনির্দেশ

১. রাজাগোপাল চট্টোপাধ্যায়, *মিথ্‌মুক্ত বিবেকানন্দ*, কলকাতা ১৯৯৮,পৃষ্ঠা ৭২
২. *স্বামী বিবেকানন্দর বাণী ও রচনা*, উদ্বোধন, কলকাতা ১৯৬২, ৮:৩১
৩. ঐ, ৮:৩২
৪. ঐ, ৮:৩৩
৫. ঐ, ৮:৩৪
৬. ঐ, ৮:৩৬
৭. ঐ, ৮:৪১
৮. ঐ, ৮:৪৩
৯. ঐ, ৮:৪
১০. ঐ, ৮:৪৭-৪৮,
১১. ঐ, ৮:৪৮
১২. ঐ, ৮:৪৯
১৩. ঐ, ৮:৪৯-৫০
১৪. ঐ, ৮:৫০
১৫. ঐ, ৮:৫১
১৬. ঐ, ৮:৫২
১৭. ঐ, ৯:৯৬-৯৭
১৮. ঐ, ৮:৫৩
১৯. ঐ, ৮:৫৪
২০. ঐ, ৮:৫৫
২১. ঐ, ৮:৫৯
২২. ঐ, ৮: ৬০
২৩. ঐ, ৮:৬২
২৪. ঐ, ৮:৬৫
২৫. *Letters of Swami Vivekanada*, Advaita Ashrama, Kolkata (1940), 2006, p.393
২৬. *ibid*
২৭. ঐ ৮:১৩৮
২৮. ঐ, ৯:১৯২-১৯৩
২৯. ঐ, ৮:১৮৪,
৩০. ঐ, ৯:১৯৫
৩১. ঐ, ৯:১৯৯
৩২. ঐ, ৯:২০৮
৩৩. ঐ, ৯:২১৩-২১৬,
৩৪. ঐ, ৯:২২৬, ২২৮
৩৫. ঐ, ৮:২০২

লেখক পরিচিতিঃ আশীষ লাহিড়ী বিজ্ঞানের দর্শন এবং বিজ্ঞান ও সমাজের মিথস্ক্রিয়া বিষয়ে বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও প্রবন্ধকার।

ডাক্তারের ডেস্ক

প্রশ্ন ১. আমার বয়স ৩৭ বছর। আমার প্রধান সমস্যা আমার ডান পায়ের শিরাগুলো অন্যগুলোর থেকে অনেক বেশি ফুলে থাকে সবসময় ও ডান পায়ে ব্যথা হয় গত বছর দুয়েক ধরে। এই সমস্যা আরও বাড়ে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে। আমার বাঁ পায়ের কোনো সমস্যা নেই। আমার ডান পায়ে একটি ঘা হয়ে আছে প্রায় এক বছর ধরে। আমি আমাদের এখানে ডাক্তারবাবুকে দেখিয়েছিলাম ও তিনি আমাকে অপারেশন করতে বলেন। আমি জানতে চাই আমার রোগটা কী ও কী করতে হবে?

সুকুমার সাঁতরা, বর্ধমান।

উত্তরঃ সুকুমারবাবু, আপনি আপনার চিঠিতে আপনার পেশার উল্লেখ করেন নি। আপনার পেশায় বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার প্রয়োজন হয় কিনা আমার জানা নেই। যাই হোক আপনার চিঠি পড়ে মনে হচ্ছে আপনার সমস্যাটি ভেরিকোস ভেন-এর (varicose vein) সমস্যা। এইসব ক্ষেত্রে রোগাক্রান্ত পায়ের শিরা ফুলে যায় ও ব্যথা হয়। অপারেশন করে ঐ শিরাগুলি/শিরাটি বাদ দিয়ে দিলে এই সমস্যা থেকে স্থায়ী মুক্তি পাওয়া যায়। এই অপারেশনটি খুব বড় অপারেশন নয়। এতে কাটা-ছেঁড়ার পরিমাণও কম হয়। আপনি এক্ষেত্রে কোনো জেনারেল সার্জেন (General Surgeon) বা কার্ডিও থোরাসিক ভাসকুলার সার্জেন (Cardio Thoracic Vascular Surgeon)-এর পরামর্শ নিলে উপকৃত হবেন।

প্রশ্ন ২. আমার বাবার বয়স ৭৭ বছর ও গত মাসে মাথায় স্ট্রোক হবার কারণে তিনি বর্তমানে শয্যাশায়ী। ডানদিকের পা ও হাত একেবারেই নাড়াতে পারতেন না। বর্তমানে একটু একটু নাড়াতে পারেন। গত দুদিন ধরে ওনার ডান পায়ে হাঁটুর নিচের দিকে মাংসপেশিতে ব্যথা অনুভব করছেন। ওখানে হাত দিয়ে টিপলে প্রবল যন্ত্রণা অনুভব করেন। বর্তমানে আমাদের গ্রামের একজন এসে বাবাকে ফিজিওথেরাপি করান। যেহেতু

বাবার পক্ষে হাঁটা-চলা সম্ভব নয় তাই ডাক্তারবাবুর কাছে নিয়ে যাওয়া যায় না। এই অবস্থায় কী করণীয় যদি বলেন?

উত্তম প্রামাণিক, ধনেখালি, হুগলি।

উত্তরঃ আপনার বাবা যেহেতু দীর্ঘদিন শয্যাশায়ী তাই তাঁর ক্ষেত্রে শিরার মধ্যে রক্ত জমাট বেঁধে থাকার জন্য হওয়া একধরনের অসুখ ডাক্তারি পরিভাষায় যাকে বলে ডিপ ভেন থ্রম্বোসিস (Deep Vein Thrombosis), এই রোগ হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। তাছাড়া জীবাণু সংক্রমণ ঘটিত অন্য কোনো রোগও হতে পারে। এছাড়া আপনার বাবার ঠিক কী ধরনের স্ট্রোক হয়েছিল ও বর্তমানে ঠিক কী ধরনের ওষুধ তিনি খান তা আপনি লেখেন নি। তাই আপনার চিঠির তথ্যের ওপর ভিত্তি করে আপনাকে পরামর্শ দেওয়া খুবই কঠিন। আপনি আপনার বাবাকে অতি দ্রুত স্থানীয় কোনো ডাক্তারবাবুকে দেখানোর চেষ্টা করুন। কারণ ডিপ ভেন থ্রম্বোসিস থেকে জমাট বাঁধা রক্ত অনেক সময় ফুসফুসে চলে গিয়ে আরও বড় ধরনের বিপদ ঘটে যাবার সম্ভাবনা থাকে।

(এ-দুটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন **ডা. অরিজিৎ বাগ**, এম বি বি এস, তিনি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি করার সাথে সাথে হাওড়ার একটি জনমুখী চিকিৎসার ক্লিনিকে কাজ করছেন।)

প্রশ্ন ৩. আমার বয়স চল্লিশ ছাড়িয়েছে। চোখে চশমার দরকার হয় না। মাস-দুয়েক হল টিভি দেখতে দেখতে বা একটানা কিছুক্ষণ পড়াশুনা করলে মাথার দুপাশ টিপটিপ করে, সব কেমন ঝাপসা লাগে। আমার মা'র শেষ বয়সে গ্লকোমা ধরা পড়ে, চিকিৎসা করেও চোখ বাঁচানো যায় নি। আমারও কি তাই হতে চলেছে? আজকাল গ্লকোমা নিয়ে খবরের কাগজে টিভিতে অনেককিছু দেখছি, কিন্তু বুঝছি না রোগটা সারে কিনা

অনুপম দত্ত, বাঁশবেড়িয়া।

উত্তরঃ সম্প্রতি গ্লকোমা নিয়ে সরকারি ও বেসরকারি দুই স্তরেই অনেক প্রচার চলছে। বহু NGO এব্যাপারে কাজ করছে। সকলেরই চেষ্টা কিভাবে এই রোগ সম্বন্ধে আরও বেশি তথ্য সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানো যায়।

আপনার প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে প্রথমেই বলি, টিভি দেখতে গিয়ে বা অনেকক্ষণ পড়াশুনা করলে চোখে-মাথায় ব্যথা হওয়া কিন্তু গ্লকোমার লক্ষণ নয়। ৪০-৪৫ বয়সে সকলেরই কাছে দেখার ক্ষমতা কমে এবং খবরের কাগজ বা বইয়ের প্রিন্ট পড়তে অসুবিধা হয়। বেশিক্ষণ এই অবস্থায় পড়ার চেষ্টা করলে মাথাব্যথা করতে পারে, চোখ দিয়ে জল পড়তে পারে ইত্যাদি। তাছাড়া দূরে দেখার জন্যও চশমা লাগতে পারে। এই অবস্থায় কোনো চোখের ডাক্তারের কাছে গিয়ে চোখ/চশমা পরীক্ষা করালেই সেরকম কেনো অসুবিধা আছে কিনা জানা যাবে। এছাড়া বই পড়ার সময় ঘরে যথেষ্ট জোরালো আলো জ্বলা, টিভি দেখার সময় ঘর অন্ধকার না করা, এগুলোও মাথা ব্যথা কমাতে সাহায্য করবে।

আপনার মায়ের যদি গ্লকোমা হয়ে থাকে, তবে আপনার বা আপনার ভাই-বোনের গ্লকোমা হওয়ার সম্ভাবনা সাধারণের চেয়ে বেশি; তার মানে এই নয় যে এ নিয়ে এখনই ভয় পাওয়ার কারণ আছে। গ্লকোমার কিছু নির্দিষ্ট লক্ষণ আছে, যেমন ঃ

১. দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া
২. ঘরের বাল্ব বা গাড়ির হেড লাইটের চারিদিকে রঙিন ছটা দেখা
৩. চশমার পাওয়ার ঘন ঘন বদলানো— এক বছরেই ২-৩ বার চশমা বদলানো
৪. হঠাৎ চোখে ব্যথা হওয়া।

জানা দরকার এই লক্ষণগুলি শুধুমাত্র গ্লকোমাতেই হয় না এবং গ্লকোমার বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এইসব লক্ষণ দেখা যায় না, ডাক্তারের কাছে প্রথম পরীক্ষা করাতে গিয়ে গ্লকোমা ধরা পড়ে। তবে যেহেতু এই রোগ চল্লিশ বছর বয়সের পরেই বেশি হয়, তাই এই বয়সে সকলের বছরে

অন্তত একবার চক্ষু পরীক্ষা প্রয়োজনীয়।

মনে রাখবেন:

১. গ্লকোমা সারানো যায় না। কিন্তু আরম্ভের পরে

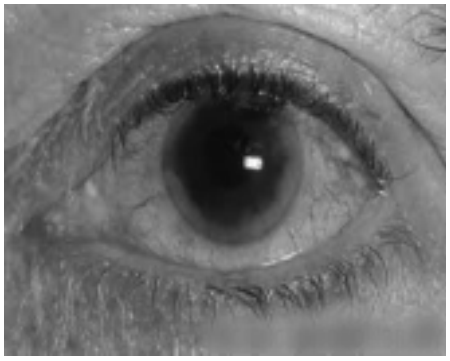

ধরতে পারলে, ওষুধ দিয়ে এবং কিছু ক্ষেত্রে অপারেশন করে, চোখের দৃষ্টি কমা সীমিত করা সম্ভব।

২. গ্লকোমা রোগীকে আজীবন ওষুধ ব্যবহার করে যেতে হবে, ডাক্তার যেরকম বলবেন সেই পরামর্শ অনুয়ায়ী চলতে হবে।

৩. ধারাবাহিক ভাবে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া অত্যাবশ্যক।

এই রোগে প্রধানত চোখের প্রেসার বাড়ে এবং চোখের স্নায়ুর ক্ষতি হয়, কিছু ক্ষেত্রে অবশ্য প্রেসার না বাড়লেও স্নায়ুর অনুরূপ ক্ষতি হতে পারে।

গ্লকোমার ক্ষেত্রে যে টেস্টগুলো সাধারণত করা হয় তা হল— চোখের প্রেসার মাপা, ফিল্ড টেস্ট এবং OCT, তবে এগুলি ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া করা উচিত নয়। কাজেই আপনি অবিলম্বে কোনো বিশেষজ্ঞ চোখের ডাক্তারের কাছে আপনার অসুবিধার ব্যাপারে পরামর্শ নিন।

(উত্তর দিয়েছেন **ডা. সোহম সরকার**, এম বি বি এস, এম এস, চক্ষু বিশেষজ্ঞ। তিনি একটি বেসরকারি চক্ষু হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক ও হাওড়ার শ্রমজীবি মানুষের একটি ক্লিনিকে চক্ষুবিশেষজ্ঞ।)

প্রশ্ন ৪. আমার মেয়ের যখন দু'বছর বয়স তখন একবার খুব জ্বর হয়েছিল। ডাক্তার বললেন ভয় নেই ভাইরাল, অ্যান্টিবায়োটিক দিচ্ছি সেরে যাবে। কিন্তু তারপর মাঝরাতে কি ভয়ানক খিঁচুনি। ডাক্তার বলেছেন বড় হলে সেরে যাবে, ততদিন জ্বর বেশি বাড়তে দেবেন না। কিন্তু ওনার কথায় ভরসা পাচ্ছি না, কী করব?

শুভ্রা ঘোষ, বেলিয়াতোড়, বাঁকুড়া

উত্তরঃ সত্যিই ভয় পাবার মতো তেমন কিছু নেই। আপনার মেয়ের যা হয়েছিল তাকে বলা হয় তড়কা বা febrile seizures বা febrile convulsion। সে বিষয়টা নিয়ে কথা বলার আগে জানিয়ে রাখি, ডাক্তারবাবু যদি ভাইরাল জ্বর ভেবে থাকেন তো তাতে অ্যান্টিবায়োটিক দেবার কোনো মানে হয় না, ওটা অ্যান্টিবায়োটিকের একটা খুব চালু অপব্যবহার।

কিন্তু আপনার মূল দুশ্চিন্তা খিঁচুনি বা তড়কা নিয়ে। মনে রাখবেন তড়কা মৃগী নয়। মৃগীরোগ স্নায়ুতন্ত্রের দীর্ঘস্থায়ী রোগ, আর তড়কা সাময়িক অসুবিধামাত্র। জ্বরের সঙ্গে খিঁচুনি হচ্ছে, অথচ মস্তিষ্কে কোনো জীবাণু সংক্রমণ বা অন্য কোনো নির্দিষ্ট কারণ পাওয়া যাচ্ছে না, এমনটাকে বলে তড়কা।

জ্বরের আগে, জ্বর নেই এমন অবস্থায় যার খিঁচুনি হয়েছে তার জ্বর থাকাকালীন খিঁচুনি হলে তা তড়কা নয়, খুব সম্ভব তা মৃগীরোগ। মৃগীরোগীদের জ্বর থাকাকালীন খিঁচুনি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। সুতরাং জ্বর থাকাকালীন বাচ্চার খিঁচুনি হলে প্রথমে জানতে হবে তার আগে কখনো জ্বর ছাড়াই খিঁচুনি হয়েছিল কিনা। সেরকম না হয়ে থাকলে ওই খিঁচুনি খুব সম্ভব তড়কা। তবে বাচ্চাকে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখে নেওয়া দরকার— মেনিঞ্জাইটিস বা এনকেফেলাইটিস, অর্থাৎ মস্তিষ্কে কোনো জীবাণু সংক্রমণ হয়নি তো।

৬ মাস থেকে ৫ বছর বয়সের ৩ থেকে ১৪ শতাংশ বাচ্চার তড়কা হতে দেখা যায়। ৫ বছরের পরে এমনটা আর হয় না। যে বাচ্চার একবার তড়কা হয়েছে ৩০ থেকে ৮০ শতাংশ ক্ষেত্রে তার আবারো তড়কা হতে দেখা যায়।

যে কোনো জ্বর যাতে শরীরের তাপমাত্রা তাড়াতাড়ি বাড়ছে তাতেই তড়কা হতে পারে। টীকা লাগানোর পর যে জ্বর হয় তাতেও তড়কা হতে পারে। সাধারণত একবারের জ্বরে একবারের বেশি তড়কা হয় না। তড়কায় বংশগতির প্রভাব দেখা যায়।

সাধারণত তড়কায় ই ই জি বা মাথার সিটি স্ক্যান করানোর দরকার হয় না। ১২ মাসের কম বয়সী বাচ্চাদের ক্ষেত্রে মস্তিষ্ক ও মস্তিষ্ক-আবরণীর সংক্রমণ (এনকেফেলাইটিস বা মেনিঞ্জাইটিস) হয়েছে কিনা দেখার জন্য কখনও কখনও কোমর ফুটো করে রস নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা হয়। বড় বাচ্চাদের এ পরীক্ষা করা হয় কেবল স্নায়ুতন্ত্রে সংক্রমণের লক্ষণ থাকলে।

আপনার মেয়ের যখন একবার তড়কা হয়েছে, তখন জ্বর হলে তাপমাত্রা বাড়তে দেবেন না। বাড়িতে প্যারাসিটামল রাখবেন, জ্বর হলেই দেবেন প্রতি কিলোগ্রাম শরীরের ওজন-পিছু ১৫ মিলিগ্রাম করে ৬ ঘন্টা ছাড়া। প্যারাসিটামলে জ্বর না কমলে হালকা গরম জলে গা মুছে জ্বর নামান। তড়কা হতে থাকলে মলদ্বারে ধীরে ডায়াজিপাম দিয়ে খিঁচুনি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

তড়কা প্রতিরোধের জন্য কোনো কোনো বাচ্চাকে ওষুধ দিতে হয়— বিশেষত যদি প্রথমবার তড়কা ১২ মাসের কম বয়সে হয়, পরিবারে কারুর তড়কা হওয়ার ইতিহাস থাকে, বাচ্চার বিকাশ যদি অস্বাভাবিক থাকে। ৮০ শতাংশ ক্ষেত্রে জ্বর শুরুর সময় থেকে পরবর্তী ২ দিন ডায়াজিপাম দিয়ে তড়কাকে রোখা যায়। বাকিদের ফেনোবার্বিটোন বা ভ্যালপ্রোয়েট দিতে হয়। তবে মনে রাখবেন, একজন চিকিৎসকের পরামর্শ ও তত্ত্বাবধান ছাড়া এসব ওষুধ দেওয়া যায় না।

তড়কা হলে ভয় পাবেন না, তড়কা স্নায়ুতন্ত্রে কোনো ক্ষতি করে না, তড়কার জন্য মানসমন্দনও হয় না।

(উত্তর দিয়েছেন **ডা. পুণ্যব্রত গুণ**, এম বি বি এস, জেনেরাল ফিজিশিয়ান, জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের এক কর্মি। বর্তমানে হাওড়ার উলুবেড়িয়া মহকুমায় শ্রমজীবী মানুষের জন্য পরিচালিত এক ক্লিনিকের দায়িত্বে আছেন।)

স্মরণে

ডা. পার্থসারথি গুপ্ত

ডা. সুব্রত গোস্বামী

নিজের পেশার প্রতি শ্রদ্ধাশীল একজন চিকিৎসক কোনও রোগ-ব্যাধির শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও যান্ত্রিক প্রয়োগেই থেমে থাকেন না— তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে জ্ঞানের বাস্তবমুখী প্রয়োগের দিকে তাঁর সমান নজর থাকে। আন্তর্জাতিক সংজ্ঞায় সুস্থতা বলতে কেবল শারীরিক ও মানসিকভাবে ছাড়াও দার্শনিক ও সামাজিকভাবে ভালো থাকাকেও বোঝায়। তাই রোগীর সামাজিক, আর্থিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাগুলোও খেয়াল রাখতে হয়। পার্থসারথি গুপ্ত এমনই একজন চিকিৎসাবিজ্ঞানী ছিলেন যিনি বৈজ্ঞানিক গবেষণার সাথে সাথে কুসংস্কার বিরোধী রচনা, স্বাস্থ্যকে পণ্যদ্রব্যে পরিণত করার কাজে লিপ্ত ''গন্ডোরিরাম বাটপাড়িয়া'' ব্যবসায়ীদের নিয়ে ব্যঙ্গ রচনা, ভাগ্যগণনাসহ জ্যোতিষচর্চার অসারতা, ক্যাপিটেশন ফি দিয়ে বেসরকারি চিকিৎসাা বিদ্যালয়, বহুজাতিক ওষুধ ব্যবসায়ীদের অনৈতিক কারবার— এসব অসংখ্য সমস্যার বিরুদ্ধে ছড়া, কবিতা, প্রবন্ধ লিখেও তার দায়িত্ব পালনের চেষ্টা আজীবন করে গেছেন— যা আজও একইরকমভাবে প্রাসঙ্গিক মনে হয়।

১৯২৮ সালের ২৩ অক্টোবর (বাংলা ৬ই কার্তিক, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ) কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন পার্থদা (হ্যাঁ এই নামেই তিনি আমৃত্যু অনেক নবীন বয়সীদেরও প্রিয়জন ছিলেন)। ১৯৩৬ সালে তিনি স্কটিশচার্চ স্কুলে ভর্তি হন এবং ১৯৪৫ সালে ম্যাট্রিকুলেশান ও ১৯৪৭ সালে ISc পাশ করে ''মেডিকেল কলেজ অব বেঙ্গল'' (তৎকালীন কলকাতা মেডিকেল কলেজ)-এ ভর্তি হন।

ছাত্রাবস্থা থেকেই তাঁর সাহিত্য ও শিল্পের প্রতিভার সৌরভে ভরে উঠত কলেজচত্বর এবং ছাত্র-শিক্ষক সকলের কাছেই তিনি জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। ছাত্র সংসদের নির্বাচন বিষয়ে ''কস্মৈ ক্যানডিডেট ভোটসা বিধেয়'' বলে একটি স্যাটায়ারধর্মী প্যারডি লিখেছিলেন যা অনেকের মনেই রেখাপাত করেছিল।

১৯৫২ সালে পার্থদা ডাক্তারি পাশ করেন এবং JC Roy Institute-এ আবাসিক চিকিৎসক হিসেবে যোগদান করেন। সেখানে ''ক্যান্সারগ্রস্ত

কোষের জীব রাসায়নিক পরিবর্তন'' বিষেয়ে তিনটি মৌলিক গবেষণাপত্র বিদেশি জার্নালে প্রকাশিত হয়।

ঐ সময় বল্লভভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে সারা ভারতে কমিউনিস্ট বিরোধী উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল— কমিউনিস্ট অভিযোগে পার্থদার উচ্চপদস্থ চিকিৎসক শচীন্দ্রনাথ চৌধুরিকে পদচ্যুত করা হয়। প্রতিবাদে পার্থদা ইস্তফা দেন নিদারুণ পারিবারিক আর্থিক সমস্যা সত্ত্বেও। ১৯৫৮ সালে পোর্ট কমিশনার্সের হাসপাতালে যোগদান করেন এবং ১৯৮৬ সালে অবসর গ্রহণ করেন।

পারিবারিক প্রয়োজনে এরপর তিনি গিল্যান্ডার আরবুথনট ও ম্যাকিনটশ বার্ন কোম্পানিতে চাকরি করেন ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত। প্রসঙ্গত ১৯৯৮ সালে গিল্যান্ডার প্রতিষ্ঠানটির কর্তৃপক্ষ কর্মিদের মেডিকেল সুবিধা হ্রাস করতে চাইলে উনি ঐ চাকরি থেকে ইস্তফা দেন।

ডা. গুপ্তের অজস্র কবিতা, রম্যরচনা, প্রবন্ধ ইত্যাদি অগ্রন্থিত অবস্থায় রয়ে গেছে। তাঁর জীবৎকালে প্রকাশিত তিনটি বই হল ''চিকিৎসা ও অপচিকিৎসা'', ''বিজ্ঞানের আলোয় জ্যোতিষ'', ও ''মেডিকো জীবনের কাব্য''। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর যেসব রচনা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল সেগুলি যথাসাধ্য সংকলিত করে প্রকাশিত হয়েছে ''পার্থসারথি গুপ্ত রচনাসংগ্রহ''।

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সংক্রান্ত অনেক কর্মকান্ডেও তিনি যুক্ত ছিলেন— যেমন ''ড্রাগ অ্যাকশান ফোরাম'', ''ডা. নর্মান বেথুন জনস্বাস্থ্য আন্দোলন''। এছাড়া শ্রমজীবি স্বাস্থ্য উদ্যোগ ও মৈত্রী স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ডা. ভাস্কর রাও জনস্বাস্থ্য কমিটি— এমন উদ্যোগগুলির তিনি ছিলেন সক্রিয় পৃষ্ঠপোষক। বাংলা পত্রিকা ''অসুখ-বিসুখ''-এর জন্মলগ্ন থেকেই তিনি যুক্ত ছিলেন।

মেডিকেল কলেজ প্রাক্তনীদের সমস্ত অনুষ্ঠানেই পার্থদা নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন। নিজের ও অন্যের লেখা নাটকে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন। ''থানা থেকে আসছি'', ''কাশীনাগের পাঁচালী'', ''চক্রবৎ'', ''বাঞ্ছারামের বাগান''— এমন অনেক নাটকে তাঁর বলিষ্ঠ অভিনয় বহুদিন অনেকের স্মৃতিতে অমলিন থাকবে।

মেডিকেল কলেজ বিল্ডিং-এর বহু আলোচিত থামওয়ালা বাড়িটি সংস্কার করে আবার যখন চালু করা হয় তখন তৎকালীন সরকারের মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক সেই ভবনটি জনসাধারণের কাজে উৎসর্গ করার বিরোধিতা করেন পার্থদা। তাঁর যুক্তিজালে মেডিকেল কলেজের প্রাক্তনীরা ঐ অনুষ্ঠান বয়কট করেছিলেন। পার্থদার যুক্তি ছিল— ''মতিলাল শীলের অর্থানুকূল্যে একবার জনসাধারণকে দান করা বাড়িটি সংস্কার করে আবার সরকার কি করে দ্বিতীয়বার জনসাধারণকে উৎসর্গ করার অনুষ্ঠান করতে পারে?'' আর রাজনৈতিক ব্যক্তি নয়, বিজ্ঞানীরা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আসতে পারেন। ২০০৫ সালে প্রাক্তনীদের পুনর্মিলন অনুষ্ঠানে তিনি সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত হন— কিন্তু ঠিক এর পরেই তাঁর প্রয়াণে তাঁর আর ঐ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা হয়নি।

তাঁর ইচ্ছার প্রতি মর্যাদা জানিয়ে মৃত্যুর পর তাঁর চক্ষুদান করা হয়। এমন একজন মানুষের মৃত্যু— হিমালয় পাহাড়ের চেয়েও ভারী এবং তাঁর জীবন যেকোনো চিকিৎসক ও চিকিৎসাকর্মির কাছে অনুকরণযোগ্য হয়ে থাকবে ভবিষ্যতেও।

লেখক পরিচিতিঃ ডা. সুব্রত গোস্বামী কলকাতা মেডিকেল কলেজের প্রাক্তনী এবং বর্তমানে একটি সরকারি হাসপাতালে কর্মরত। মেডিকেল কলেজ প্রাক্তন ছাত্র সংগঠনের সদস্য হিসাবে এবং বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা ব্যবস্থার জন্য আন্দোলনের এক কর্মি হিসাবে তিনি বহুদিন ডা. পার্থসারথি গুপ্তের অনুজপ্রতিম সহকর্মি ছিলেন।

কে?

ডা. সিদ্ধার্থ গুপ্ত

১

দেওয়াল ঘড়িটায় ন'টা বাজতে সম্বিত ফরল ড. চৌবের। এই অত্যাধুনিক মলিকিউলার বায়োলজির গবেষণাগারের মধ্যে কিছুটা বেমানান পুরোনো আমলের পেন্ডুলামসহ ওয়াল-ক্লকটা। সখ করে লাগিয়েছেন অ্যান্টিক জিনিসের প্রতি আকর্ষণবশত। দ্রুত হাতে টিসু কালচার টিউবগুলো আল্ট্রা ভায়োলেট চেম্বার থেকে সরিয়ে সুইচ অফ করলেন চৌবে স্যার। বায়োসেফটি ক্যাবিনেটের ডালা বন্ধ করে, শেকার ইনকিউবেটরটা চালু করে দিলেন। সারারাত চলবে ওটা। কাল সকালে এসে দেখতে হবে কতদুর বাড়বৃদ্ধি হল রক্তবীজের বংশধরদের। পেট্রিডিসগুলো সিঙ্কে নামিয়ে আর অটোপিপেটগুলো যথাস্থানে রেখে খুলে ফেললেন হাতের দস্তানা, মাস্ক ও গাউন। অ্যান্টিরুমের ক্যাবিনেট থেকে ব্লেজারটা সংগ্রহ করে ইউ. ভি. শাওয়ারের তলায় বাথ নিতে মিনিট পাঁচেক। তারপর দরজার ল্যাচ ঘুরিয়ে বন্ধ করে করিডোরে এসে দাঁড়াতে আর এক মিনিট। টানা লম্বা বারান্দা, আলো আঁধারিতে ভরা। দুপাশে সারি সারি ঘরের সব কটাই বন্ধ। দু-একটা ফ্লুরোসেন্ট লাইট জ্বলছে। করিডোরের মাথায় কাচের দরজা ঠেলে বেরিয়ে এলেন এই গ্রেড থ্রি গবেষণাগারের নিরাপত্তা বলয় ত্যাগ করে। সহকর্মিরা সবাই এতক্ষণে নিশ্চয়ই হাজির হয়ে গেছেন অধিকর্তা ড. আগাসের পার্টিতে। ঝকঝকে কাট্গ্লাসে সোনালী তরল তিন চার দফায় ঘুরে গেছে এর মধ্যে। কিন্তু এসব নয়, ড. দীননাথ চৌবের চোখে ভাসছিল এ বাই এ-থ্রি কোয়াটার্সের বারান্দায় সুসজ্জিতা শ্রীমতি ঈশিতা চৌবের ভ্রূকুটি কঠোর দুটি চোখ, আর কপালের ক্রুদ্ধ ভাঁজ। যথারীতি দেরি হয়ে গেছে দু ঘন্টা। তবু শেষ চেষ্টায় এলিভেটরের বোতাম টিপে দ্রুত নামলেন বেসমেন্টে। প্রায় দৌড়ে বেরোলেন পার্কিংলটে, দারোয়ান শিউপূজনের কুর্নিশ না দেখেই। ন'টা সতেরোয় ছিটকে বেরোল সদ্য কেনা ফোর্ড আইকন। এখনো চেষ্টা করলে বোধহয় ম্যানেজ করা যায়। ঈশিতাকে তুলে পার্টিতে পৌঁছতে আর মিনিট পনেরো।

ক্যাম্পাস থেকে কোয়ার্টার চার কিলোমিটার মত। উঁচু নীচু পাহাড়ের গায়ে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা এই বিজ্ঞান ও শিল্প উপনগরীর এই জায়গাটা এখনো অর্ধ-আলোকিত। দূর থেকে স্টাফ কোয়ার্টারের উজ্জ্বল আলো দেখা যাচ্ছে। এক মনে ড্রাইভ করতে করতে ড. দীননাথ চৌবে অনুভব করলেন মাথায় একটা যন্ত্রণা হচ্ছে, হাত-পাগুলো যেন শক্ত হয়ে আসছে। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেল। চশমায় কিছু পড়ল নাকি? একটু থামাবেন গাড়িটা? থাকগে, এক্ষুণি তো পৌঁছে যাবো, ভাবলেন মনে মনে। শারীরিক অসুস্থতার কথা ঈশিতাকে বলা যাবে না, ভাববে পার্টিতে না যাবার অজুহাত। নাঃ, বেশ কষ্ট। গলায় তীব্র জ্বালা। অ্যাসিডিটি না আবার সেই রিফ্লাক্স? দুপুরের স্যান্ডউইচটা বোধহয় হজম হয়নি। ভাবতে ভাবতেই মাথাটা ঘুরে গেল, ফেটে পড়তে চাইল যন্ত্রণায়। বুকের কাছটায় অসহ্য ব্যথা। সর্বশক্তি দিয়ে ব্রেক চেপে চেষ্টা করলেন গাড়ি থামাতে। চেতনার অন্ধকারে তলিয়ে যেতে যেতে দীননাথ ভাবলেন আমার কি বাবার মত হার্ট অ্যাটাক হচ্ছে! তিনি বুঝতে পারলেন না হঠাৎ তাঁর চোখ দুটো ফেটে অক্ষিগোলকের বাইরে বেরিয়ে এসেছে, দরদর করে গড়িয়ে আসছে কাঁচা রক্ত। গায়ের চামড়া ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটে ভিজিয়ে দিচ্ছে দুধসাদা সীটকভার। হাত দুটো চেপে বসেছে স্টিয়ারিং-এ। কিন্তু গরমে রাস্তার পিচ গলে যাবার মতো যেন অসহ্য তাপে গলে গেছে হাত ও মুখের অনাবৃত জায়গার মাংস। মিনিট পনেরোর মধ্যে দীননাথ পরিণত হয়েছেন এক বীভৎস রক্তাক্ত মৃতদেহে। আর তাঁর জেড ব্ল্যাক ফোর্ড আইকন হেডলাইট জ্বলা অবস্থায় একটা গাছের গুঁড়িতে ধাক্কা মেরে অচল হয়ে পড়েছে।

২

কুকুরটা কাঁদছিল। অনেকক্ষণ ধরে, থেমে থেমে, আকাশে থালার মতো চাঁদের দিকে তাকিয়ে। এক আদিম কান্নার সুর— যা সে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে তার লক্ষ বছর আগেকার পূর্বপুরুষের কাছ থেকে। মানুষের সাহচর্যে বনচারী হিংস্র নেকড়ে পরিণত হয়েছিল গৃহপালিত সারমেয়তে। কিন্তু তার গলায় থেকে গিয়েছে মেসোজয়িক যুগের সেই আদিম সুর— প্রিয়জন বিচ্ছেদের আর্তি। মানুষের বিশ্বস্ত, অতি নিকট আত্মীয় এই পশুহৃদয়ের গভীরতম তন্ত্রীতে ঝংকার তুলে ফিরছিল সব হারাবার হাহাকার। তার সহজাত বোধ ও প্রবৃত্তিতে সে বুঝতে পেরেছে, তাকে যারা ভালোবাসত, খেতে দিত— তারা কেউ আর নেই। সেই বাচ্চা ছেলেগুলো যাদের দুষ্টুমি মাঝে মাঝে অসহ্য হয়ে উঠত, যারা গলায় দড়ি বেঁধে টানত, ল্যাজে টিনের কৌটো বেঁধে দিত— আবার জড়িয়ে ধরে আদর করত, ছুঁড়ে দিত খাবারের টুকরো— তারা সবাই যেন প্রায় একসঙ্গে, এক লহমায় অতীত হয়ে গেছে। তারা, তাদের মা, বাবা, বন্ধু, আত্মীয়, পরিজন সবাই পরিণত হয়েছে তাল তাল মাংসপিন্ডে। এত বিকৃত সেইসব মাংসপিন্ড যে সঠিকভাবে চিনে নেওয়া শক্ত, কে ছিল রামপ্রসাদ, কে লছমী, কার নাম ছিল ব্রিজেশ কেই বা শিউদুলারী। অন্ধকারে সারা গ্রামটা ধরে ছড়িয়ে আছে বাসিন্দাদের মৃতদেহ। কেউ নিঃশব্দে মারা গেছে ঘরের ভেতর। কেউ যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে ছিটকে পড়েছে চৌকাঠ বা কাঁচামাটির উঠোনে। যেন কৃতান্ত এক প্রবল বিষবাষ্প রূপে উপস্থিত হয়ে অগস্ত্যের মতো এক চুমুকে পান করছে সমস্ত গ্রামবাসীর প্রাণটুকু— শিশু, বৃদ্ধ, মহিলা, পুরুষ নির্বিশেষে। খাটিয়ার উপর , কুয়োতলায়, রাস্তার ধারে, ঝোপে জঙ্গলে ছড়িয়ে আছে বিয়াল্লিশটি লাশ— প্রায় প্রতেকের দেহ থেকে গড়িয়ে এসেছে অজস্র রক্ত যা এতক্ষণে কালচে হয়ে গেছে। চোখগুলি পুরোপুরি বা অর্ধেক বেরিয়ে এসেছে কোটর ছেড়ে। গলে গেছে চোখের মণি, খসে খসে পড়ছে হাত পায়ের মাংস।

দৈনন্দিন কাজকর্মের পর রাত্রির আহার সেরে প্রায় ঘুমিয়ে পড়া গ্রামে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে করাল নিয়তি এসে স্তব্ধ করে দিয়েছে জীবনের স্পন্দন। শুধু এই হত্যালীলার পাশ কাটিয়ে বেঁচে আছে গ্রামের নেড়ি কুকুর মুন্নি আর তার দু একজন ভাই বেরাদর। আর আছে গোয়ালে গরু মোষের দল। পা ঠুকছে, ল্যাজ নেড়ে পোকা তাড়াচ্ছে, যেন তারাও টের পেয়েছে তাদের মালিকরা আর নেই। আছে বাড়ির উঠোনে বা বারান্দায় খাঁচায় দোলা পাখিরা, ঝটপট করছে, ডানা ঝাপটাচ্ছে, অনুভব করছে বাতাসে মৃত্যুর বিষ। কিন্তু যারা তাদের এতদিন ধরে দানা দিয়ে, জল দিয়ে পুষেছে, কথা শেখাতে চেয়েছে, তারা আজ মুছে গেছে চরাচর থেকে।

৩

অধিকর্তার ঘরে বিরাজ করছিল বাতানুকূল নৈঃশব্দ। সেই শব্দহীনতাকে ভেদ করে শোনা গেল ড. নাম্বুদ্রির কণ্ঠস্বর, 'তাহলে এব্যাপারে আপনার কোন ধারণাই নেই, ড. আগাসে?' অধিকর্তার অসহায় দেহভঙ্গি ফুটল তার কণ্ঠস্বরে, 'কি বলব, ড. নাম্বুদ্রি, শিউপূজন যাকে কিছুক্ষণ আগেও সুস্থ দেখেছে— তাছাড়া গাড়ি ক্র্যাশ করেও তো নয়...'

গবেষণাগার ও সংলগ্ন গ্রামে গণমৃত্যুর রহস্যময় পদসঞ্চারে উদ্বিগ্ন কেন্দ্রিয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক দ্রুত পাঠিয়েছেন বিশেষজ্ঞ দল, এই প্রহেলিকার কারণ অনুসন্ধানে। নেতৃত্বে প্রবীণ বিজ্ঞানী ড. নাম্বুদ্রি।

ড. নাম্বুদ্রি এসেছেন কেন্দ্রিয় সরকারের বায়োটেকনোলজি দপ্তর থেকে। সঙ্গে আছে মাইক্রোবায়োলজিস্ট ড. সহায়, পদার্থবিজ্ঞানী ড. কানোয়ালজিৎ, ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ ডা. পট্টনায়েক এবং মলিকিউলার বায়োলজিস্ট ড. সুরজিৎ সেন।

'মিসেস চৌবের ফোন পেয়েই প্রথমে আপনারা ঘটনাটা জানতে পারেন তাই তো?' প্রশ্ন করলেন ড. কানোয়ালজিৎ।

'মিসেস চৌবে প্রথমে ফোন করেন সিকিউরিটি অফিসারকে। রাত দশটা পর্যন্ত চৌবে বাড়িতে না ফেরায় উনি প্রথম চৌবের সেলফোনে ফোন করে। সেটা বেজেই যাচ্ছে দেখে...'

এই নিয়ে তৃতীয়বার এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন ড. আগাসে।

'ঠিক কি নিয়ে কাজ করছিলেন ড. চৌবে?' প্রশ্ন সহায়-এর।

'শস্য ও গাছের রোগ সৃষ্টিকারী ভাইরাস নিয়েই ছিল ড. চৌবের গবেষণা। তাছাড়া নানা শিল্পসংস্থার ফরমাশী কাজকর্মও করতে হত, যেমন পলিমারেজ চেন রিঅ্যাকশনের প্রাইমার বানানো। বর্তমানে কাজ করছিলেন তামাকপাতা, তুলোর বীজ ও তাদের রোগ সংক্রমণ নিয়ে।'

'মানে এখানে এমন কিছু মারাত্মক ভাইরাস নিয়ে কাজ হত না, যার সংক্রমণে মৃত্যু হতে পারে' ড. সহায়ের নির্দিষ্ট ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন।

'কোনোমতেই না।' দৃঢ় গলায় জানালেন অধিকর্তা।

'তাছাড়া কোনো ভাইরাস এত দ্রুত, এত বীভৎস মৃত্যু ঘটায় বলেও আমার জানা নেই।'

'সবচেয়ে বড় কথা, গবেষণাগারের সাথে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন, প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে বড়োয়া গ্রামের লোকদের একইভাবে মৃত্যু ঘটল কিভাবে!' ডা. পট্টনায়েক বেশ উত্ত্বেজিত।

'আর একটা কথাও ভাবার আছে' অসহায়তার সুরে বললেন সহায়, 'এত সংক্রামক ভাইরাসের আক্রমণই যদি হয়ে থাকে, যে সব সাফাইকর্মি পরের দিন ড. চৌবে বা গ্রামবাসীদের মৃতদেহগুলো তুলেছিল তারা কিভাবে এখনও সুস্থ আছেন?'

'অবশ্য ঐ সব সাফাইকর্মিদের এখন পর্যবেক্ষণে রাখা আছে', ড. কানোয়ালজিৎ মনে করিয়ে দিলেন।

'পুনের ভাইরোলজির জাতীয় গবেষণাগারে মৃতদেহের রক্ত, কোষকলা এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অংশ পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে', ড. আগাসে জানালেন, 'রিপোর্ট এখনো আসে নি। ভাইরাস ছাড়া অণুজীবের সন্ধানও করা হচ্ছে। কিন্তু কিছুই এখনো পাওয়া যায় নি।'

'এখন পর্যন্ত যা পাওয়া গেছে কেবলমাত্র পোস্টমর্টেম রিপোর্ট', আর তাতে বলছে ...'

ড. নাম্বুদ্রির গলায় হতাশা।

৪

''আশ্চর্য এবং ভয়াবহ'' ময়না তদন্তের রিপোর্টে তৃতীয়বার চোখ বুলোতে বুলোতে বললেন ডা. পট্টনায়েক। ''বিশেষভাবে গোপনীয়'' শীর্ষক রিপোর্টের প্রতিলিপি মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে বিশেষ সরকারি ডাক মারফৎ হস্তগত হয়েছে বিশেষজ্ঞদলের। কী আছে ডা. চৌবের সুরতহালের রিপোর্টে?

''শরীরের মহাধমনী ফেটে গেছে অসম্ভব কোনো চাপে, মাথার মধ্যে প্রচন্ড রক্তপাত হয়েছে, হাতপায়ের বড় বড় ধমনীগুলোও জায়গায় জায়গায় ফেটে গেছে। তার সঙ্গে ঘটেছে আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার। শরীরের বহু মাংসপেশি গলে গেছে, চর্বিও। পরিভাষায় যাকে বলে 'অ্যাকিউট র‍্যাবডোমায়োলাইসিস এবং লাইপোডিসট্রফি'। ব্যাপক রক্তপাত হয়েছে কিডনি, অন্ত্র ও ফুসফুসে। পুরো পেরিকার্ডিয়াল স্যাক-ই রক্তে ভর্তি। জানা কোনো অসুখে বা কোনো বিষে এত দ্রুত, এত সর্বাত্মক মৃত্যু সম্ভব নয়", একদমে অনেকটা বলে ঢকঢক করে এক গ্লাস জল খেলেন ডা. পট্টনায়েক।

'আর বেয়াল্লিশ জন গ্রামবাসীর ময়না তদন্তের রিপোর্টও যেন এই রিপোর্টেই জেরক্স কপি। শুধু নাম, বয়স আর লিঙ্গ আলাদা।' ড. নাম্বুদ্রির কথায় একটা আতঙ্কের বাদুড় যেন ডানা ঝাপটে উড়ে গেল ঘরের মধ্যে দিয়ে।

ড. কানোয়ালজিৎ বললেন, 'একবার স্থানীয় পুলিশের সঙ্গে গিয়ে বাড়োয়া গ্রামটা দেখে এলে হয় না?' 'আমার মনে হয়', এই প্রথম কথা বললেন সুরজিৎ সেন। বয়সে ও অভিজ্ঞতায় অনেক কম বলে তিনি চুপচাপই ছিলেন এতক্ষণ, 'যদি ড. চৌবের ল্যাবটা আর একবার...।' অসহিষ্ণুভাবে মাঝপথেই তাঁকে থামিয়ে দিলেন নাম্বুদ্রি, 'ঐ ল্যাবের প্রতি ইঞ্চি জায়গা আমরা গত চারদিনে পরীক্ষা করে দেখেছি, ড. সেন। সব রেকর্ডস, নোটস, কম্পিউটার ফাইল, ডাটাবেস, সব। সমস্ত টিসু কালচার, স্লাইড, স্পেসিমেন জার পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করে কিছু না পেয়ে আপাতত ল্যাবরেটরি সিল করে দেওয়া হয়েছে। এখন খোঁজা নেহাত পন্ডশ্রম।' ঝুঁকি নিয়েও সুরজিৎ বলে ফেললেন,'যেহেতু ড. চৌবের গবেষণার বিষয় ছিল ভাইরাস নিয়েই, তাই ভাবছিলাম...' 'তাতে কি?' বললেন ড. সহায়। ''ড. চৌবে কাজ করছিলেন শস্যের ক্ষতি করে এমন ভাইরাসের ওপর। গাছের ভাইরাস এমন প্রাণঘাতী হয়ে মানুষ মারবে, এ তো অবিশ্বাস্য।' চুপ করে গেলেন সুরজিৎ, অধিকর্তার ঘরে আবার নেমে এত দক্ষিণ মেরুপ্রদেশের হিমশৈলের মত শীতল স্তব্ধতা।

৫

স্থানীয় ইন্সপেক্টর গজেন্দ্র শর্মাকে স্পষ্টতই বেশ অসহায় লাগছিল। সরেজমিনে তদন্তে কিছুই পাওয়া যায় নি, এ কথাটা এত ভয়ংকর রকমের সত্যি যে তা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। কিন্তু স্বীকার করার মানেই হল নিজের অপদার্থতার কথা স্বীকার করা। তারপর আছে উপর মহলের চাপ, আছে মিডিয়ার খবরদারি। ধূর ছাই এই চাকরি ছেড়ে দেওয়াই ভালো। গত কয়েকদিন ধরে ঠিকমত না হয়েছে খাওয়াদাওয়া, না হয়েছে একটু বিশ্রাম। আর গোদের উপর বিষফোঁড়া হিসাবে আছেন ঐ পাঁচজন বিজ্ঞানী। কী যে সব উদ্ভট কথাবার্তা বলেন, কিছুই বোঝা যায় না। অবশ্য ঐ সেন ভদ্রলোক বেশ ভালো। বেশ গল্প করেন। বলেছেন, ড. চৌবের মতো উনিও একজন

মলিকিউলার বায়োলজিস্ট, জিন নিয়ে গবেষণা করেন। তারপর ইন্সপেক্টরের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু দয়াপরবশ হয়েই বোধহয় জানিয়েছেন, প্রাণীদেহে বংশগতির ধারক হল জিন, যার জন্য ধানের বীজ থেকে ধানই হয় আর মানুষের বাচ্চা হয় মানুষ। এই জিন আবার গড়ে উঠেছে অনন্য এক উপাদান দিয়ে যার নাম ডি এন এ, ব্রহ্মাণ্ডে যার তুলনা পাওয়া ভার। ড. সেনের কাছ থেকে গল্পোচ্ছলে এও জেনেছেন ইন্সপেক্টর, কেমন করে জিন রসায়নবিদরা চেষ্টা করছেন ও সফল হয়েছেন খোদার উপর খোদকারি করতে। একটা জিনকে টুকরো করে কেটে, তাতে অন্য একধরনের জিন প্রবেশ করানো যায়, আরও কত কি! এভাবে নানা রোগ নিরাময় নাকি সম্ভব। শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল যেন রূপ-কথা। কিন্তু যার মাথায় এতগুলো মৃত্যুরহস্যের তদন্তের ভার তার কি গল্প শোনার সময় আছে! দুজন বিজ্ঞানী যেতে চান বড়োয়া গ্রামে, কি দেখতে কে জানে! আর ড. সেন যেতে চান ঈশিতা চৌবের কাছে। একা মানুষ আর কত দিক সামলাতে পারে। তাই ড. সেনকে উনি একাই যেতে বলেছেন মিসেস চৌবের কাছে। অবশ্য ভদ্রলোক কথা দিয়েছেন, কোন দরকারি তথ্য বা খবর পেলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে তা পুলিশকে জানাবেন। ভদ্রলোককে বিশ্বাস্য ও নির্ভরযোগ্য বলেই মনে হয়। কম লোক তো দেখলেন না এত বছর ধরে।

৬

কী? কেন? সুরজিৎ সেন ভাবছিলেন। কোনো উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হত্যা না নিছকই দুর্ঘটনা!

কীভাবে? কী সেই বিধ্বংসী অস্ত্র যা নিজে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় অথচ মৃত্যুকে করে যায় নিশ্চিত, অমোঘ। কে? হত্যাই হোক বা অ্যাকসিডেন্ট, কোনো মানুষ তো নিশ্চয়ই আছেন এর পেছনে। কে তিনি? এই প্রশ্নটার উত্তরই প্রথমে দরকার। তারপর একে একে আসবে অন্য সমস্যার সাধান।

সুরজিৎ সেনের মাইনাস সাতের মায়োপিক লেন্সে ঢাকা বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দুটি এক্স রে-র মত ভেদ করে যেতে চাইছে যাবতীয় ঘটনা। তিনি বসে আছেন ঈশিতা চৌবের ড্রয়িংরুমে। ফোনে যোগাযোগ করে আসা সত্ত্বেও বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হল তাকে।

'বলুন কী জানতে চান?' মিসেস চৌবের নিষ্প্রাণ প্রশ্নে সচকিত হয়ে বসলেন সুরজিৎ। 'ড. চৌবের কি কেন শত্রু আছে ম্যাডাম, যিনি তাকে হত্যা করতে চাইতে পারেন?' আকস্মিক প্রশ্নে বেশ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন ঈশিতা। 'একদমই না', উত্তরে কিন্তু কোনো দ্বিধা নেই। 'ড. চৌবে কি আঁচ করেছিলেন এ ধরনের কিছু ঘটতে চলেছে? কোনো ভয়, উত্তেজনা বা অন্যরকম কিছু আপনি লক্ষ্য করেছিলেন?' 'না, উনি বরাবরই খুব ঠান্ডা মাথার মানুষ। কিছুতেই অতিরিক্ত উত্তেজিত বা বিচলিত হতেন না।'

'বাড়িতে ড. চৌবে যে জায়গায় কাজ করতেন, সেটা একটু দেখা যাবে?' সুরজিৎ দমবার পাত্র নন। আপত্তি করেন নি মিসেস চৌবে। ড. চৌবের ঘরের এক পাশে কম্পিউটার, অজস্র সিডি, নোটস, বই। লেখার টেবিলেও বেশ কিছু ফাইল, প্রতিটিতে ওপরে নাম লেখা। দেখেই বোঝা যায় বেশ গোছানো লোক ছিলেন দীননাথ চৌবে। লেখার টেবিলের উপরে ডিসপ্লে বোর্ড। তাতে দেশ বিদেশের নানা বৈজ্ঞানিক খবরের প্রিন্ট আউট বোর্ডপিন দিয়ে আটকানো। কিছু কিছু আবার হাইলাইটও করা আছে। পকেট থেকে নোটবুক খুলে দু-একটা খবর টুকেও নিলেন সুরজিৎ সেন। একটু হতাশই লাগছিল তাকে।

হঠাৎই ঈশিতা বললেন,' ড. সেন, একটা ঘটনা, খুবই সমান্য— তবে আমাকে খুবই অবাক করেছিল।' 'কী ঘটনা ম্যাডাম, বলুন না।' সুরজিৎ উৎকণ্ঠিত। 'ঘটনার দিন চৌবে লাঞ্চের জন্য বাড়ি এসেছিলেন। পরনের শার্টটা পাল্টে অন্য একটা শার্ট পরে ল্যাবের দিকে যান। পরে ল্যাব থেকে ফোন করে আমায় বলেছিলেন, ওই ছেড়ে রাখা শার্টটা যেন আমি ওয়ার্ডরোবে তুলে রাখি। একবার পরা জামা না কাচিয়ে উনি কখনো পরেন না। সেটা একবারে ওয়ার্ডরোবে তুলে রাখা...'

'শার্টটা কি আপনি দেখেছিলেন ম্যাডাম?'

হ্যাঁ, ড. সেন কিছুই ছিল না তাতে। শুধু বুকপকেটে চশমার খাপটা ছিল। চশমাটা অবশ্য ওনার চোখেই ছিল। আমি সেরকম ভাবেই তুলে রেখেছি ওটা।'

'একটু নিয়ে আসবেন প্লীজ', উত্তেজনায় সুরজিতের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। শার্টের পকেট থেকে বের করে নিলেন চশমার খাপটা। ভেতরে কি যেন রয়েছে। দ্রুত হাতে খুলে ফেললেন ঢাকনাটা। একটা দুই জি.বি. ধারণক্ষমতার পেনড্রাইভ।

'এটা একটু আমাকে নিয়ে যেতে অনুমতি দিতে হবে ম্যাডাম,' বললেন সুরজিৎ সেন। মন বলছে রহস্য সমাধানের সোনার চাবিকাঠি হাতে এসে গেছে।

৭

পেনড্রাইভটা অনায়াসেই খুলে গেল সুরজিতের ল্যাপটপে। কিন্তু এসব কি? গুগল্ উইকিপেডিয়া থেকে ডাউনলোড করা অতি সাধারণ কিছু তথ্য। ভাইরাস কাকে বলে, মানুষ, পশু ও উদ্ভিদের কিছু সাধারণ ভাইরাসের নাম ও ছবি। তারপর মলিকিউলার বায়োলজির পাতি কথাবার্তা। স্নাতকোত্তরে পড়ানো হয় এমন কিছু প্রযুক্তি। এসব কেন একজন বৈজ্ঞানিক পেনড্রাইভে তুলে রেখেছেন, ভাবছিলেন সুরজিৎ। আরে, এই তো এই ফাইলটা কী? নামটা বাহারি, ট্রেজার আইল্যান্ড। ভেসে উঠছে বেশ কিছু জিনের গঠন, অনেকগুনি নতুন প্রযুক্তি আর অপরিচিত বা অল্প পরিচিত বেশ কিছু ওয়েবসাইটের ঠিকানা। এক এক করে এগুলি দেখা দরকার। ইন্টারনেট চালু করলেন সুরজিৎ। হঠাৎই বেজে উঠল সেলফোন। 'বলুন ইন্সপেক্টর শর্মা। না না দরকারি কিছু পেয়েছি কিনা বলতে পারছি না এক্ষুণি, আর একটু সময় লাগবে। ওদিকে বাড়োয়া গ্রামে কি হল? কী, ড. সহায় একটা জিনিস পেয়েছেন? কী জিনিস? উনি বলছেন কালচার টিউব? শুনুন, ইন্সপেক্টর, ঐ গ্রাম থেকে কেউ নিশ্চয়ই সেদিন চৌবের ল্যাবে গিয়েছিল। আপনি একটু ভালোভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করে দেখুন তো। হ্যাঁ সব কিছু দেখুন। হ্যাঁ, হ্যাঁ...'

ঈশিতা চৌবেও ভাবছিলেন আর একটু ভালোভাবে দেখা দরকার, কাগজটা পুলিশের হতে তুলে দেওয়া উচিত কিনা। এটা যে বেশ দরকারি কাগজ, রহস্যভেদে এর যে একটা ভূমিকা থাকতে পারে তাতে তাঁর আর সন্দেহ নেই। কাগজটা একটা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের স্টেটমেন্টের প্রিন্ট আউট। দীননাথ চৌবের পারসোনাল ই-ব্যাঙ্কিং অ্যাকাউন্ট, যাতে ঈশিতার কোনো নাম নেই। এর অস্তিত্বও ঈশিতার জানা থাকত না, যদি না হঠাৎ ওনার লেখার টেবিল গোছাতে গিয়ে এটা পাওয়া যেত। গত ছয় মাস ধরে প্রচুর টাকা জমা পড়েছে এই অ্যাকাউন্টে, প্রচুর টাকা তোলাও হয়েছে ওখান থেকে। এই টাকা যে মাইনের টাকা নয়, ঈশিতা জানেন। কারণ মাইনের চেক জমা

পড়ে ওদের যৌথ অ্যাকাউন্টে। মানে দীননাথের রোজগারের আরও উৎস ছিল। কী সেটা? স্টেটমেন্ট অনুযায়ী লগ-ইন করে দেখেছেন ঈশিতা, ওরা পাসওয়ার্ড চাইছে, যা তাঁর জানা নেই। ফলে আর এগোনো সম্ভব হচ্ছে না। তবে কী দীননাথ জড়িয়ে পড়েছিলেন কোন দুর্নীতিচক্রের সঙ্গে! প্রায়ই তো বলতেন, 'আমাদের জীবনযাত্রার যা মান, তার তুলনায় মাইনে বড়ই কম।' ঈশিতাকে শুনিয়ে শুনিয়েই বলতেন। তিনি তো জানেনই, এই ফ্ল্যাটের আসবাবপত্র, পর্দা, বেডকভার, কিচেন গ্যাজেটস, বিলাসিতার অন্যান্য উপকরণ, তাঁর শাড়ি, গয়না সবই উৎকৃষ্ট মানের ও দামের। ড. চৌবে নিজেও তো কম শৌখিন ছিলেন না। কিভাবে এতসব আসছে, মাইনের টাকায় সব সম্ভব কিনা, এসব ঈশিতা কখনো ভেবে দেখেন নি। নিজের ইচ্ছে মতন অর্থের জোগান পেয়েই সন্তুষ্ট থেকেছেন বারবার। ভুল হয়ে গেছে বড়। কিন্তু না, পুলিশকে কিছু জানাবেন না ঈশিতা। ওরা বড় হয়রান করে, বরং সুরজিৎ সেনকেই একটা ফোন করা যাক।

৮

আবার অধিকর্তার ঘর। আছেন ডা. আগাসে, পাঁচজন বৈজ্ঞানিক, আছেন ইন্সপেক্টর গজেন্দ্র শর্মাও। ন্যাশানাল ইনস্টিটিউট অফ ভাইরোলজি থেকে এসে পৌঁছেছে রক্ত ও কোষকলা পরীক্ষার রিপোর্ট। 'এবোলা ভাইরাস' নামে এক ভাইরাসের অ্যান্টিবডি পাওয়া গেছে তাতে, যদিও জীবিত কোন ভাইরাস পাওয়া যায় নি।

ড. সহায় বলছেন 'এবোলা ভাইরাস?' আফ্রিকার সবুজ বানর থেকে আসা ভয়ঙ্কর এবোলা? হ্যাঁ অবশ্যই তাতে শরীরের বহু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিকল হয়ে যায়— মৃত্যুও প্রায় নিশ্চিত। কিন্তু তাতে তো এমন দু-চার ঘন্টার মধ্যে মৃত্যু হয় না। আর ময়না তদন্তের রিপোর্টে যেমন দেখছি, সেরকম ধ্বংস হয়ে যায় না শরীরের সমস্ত কোষকলা। এবোলার সংক্রমণ হতে লাগে প্রায় এক সপ্তাহ। মৃত্যুও আসে দশ-পনের দিন বাদে। ড. চৌবে বা গ্রামবাসীদের তো তা হয় নি।' সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত জীবাণু বিশেষজ্ঞ।

'তাছাড়া এই ভাইরাস এলই বা কোথা থেকে' জিজ্ঞেস করলেন ড. কানোয়ালজিৎ।

'যেখান থেকেই আসুক, ড. সেনের সন্দেহই তাহলে ঠিক প্রমাণিত হল', বললেন ড. নাম্বুদ্রি, গলায় বুঝি অনুতাপের সুরের সাথে শ্রদ্ধাও মিশে আছে কনিষ্ঠের প্রতি।

সকলের দৃষ্টি ঘুরে গেল সুরজিৎ সেনের দিকে। আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে অথচ বিনীত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালেন সুরজিৎ। বললেন,''ড. চৌবের বাড়ি থেকে আমি একটা পেনড্রাইভ পাই। তা থেকে এমন কিছু তথ্য আমি পেয়েছি যার সাহায্যে এই রহস্যের সম্ভাব্য সমাধান ব্যাখ্যা করতে পারি।''

ঘরের সকলেই বাকরুদ্ধ। শুধু ইন্সপেক্টর শর্মা বললেন,''একটু সহজ করে বলবেন স্যার, সংবাদ মাধ্যম দিয়ে জনসাধারণের কাছে ব্যাপারটা পৌঁছানো বিশেষ দরকার।''

'ড. চৌবে ছিলেন একজন অত্যন্ত প্রতিভাবান বৈজ্ঞানিক। শুধু পরীক্ষায় পাওয়া নম্বরের ভিত্তিতেই নয়, বিজ্ঞান তিনি ভালোবাসতেন মনে প্রাণে। মৌলিক চিন্তা ভাবনাও ছিল তাঁর। এই গবেষণাগার যতই আধুনিক হোক না কেন, এখানকার কাজকর্ম কিছুটা একঘেয়ে হয়ে উঠেছিল তাঁর কাছে। ড. চৌবের মধ্যে ছিল উচ্চাশা, আত্মবিশ্বাস আর নতুন কিছু করার স্বপ্ন। এর সঙ্গে যোগ হয়েছিল তাঁর অর্থপিপাসা। কিন্তু এই ল্যাবে পুরো সময় কাজ করে অন্য কোনো কিছু করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই এই গবেষণাগারকে কেন্দ্র করেই তিনি তাঁর অভীষ্ট পূরণের পথ খুঁজতে থাকেন।'

নিঃশব্দ ঘরে গম গম করছে সুরজিতের গলা—

'কী সেই পথ, সে প্রসঙ্গে পরে আসছি। তার আগে দুটি আন্তর্জাতিক ঘটনার কথা বলি যা আমি ড. চৌবের বাড়ির ডিস্প্লে বোর্ডে দেখি।

এক নম্বর খবর, ২০০২ সালে একার্ড উইমার নামে এক জার্মান জিন বিজ্ঞানী গবেষণাগারে একটি জীবন্ত সংকর ভাইরাস তৈরি করেন। ইন্টারনেট থেকে তিনি সংগ্রহ করেছিলেন প্রয়োজনীয় জেনেটিক কোড আর বিভিন্ন ভাইরাসের ডি. এন. এ. তিনি ইন্টারনেটের মাধ্যমেই ক্রয় করেন। এগুলিকে তিনি সংযুক্ত করেছিলেন নিজের গবেষণাগারে। এই নিয়ে আলোচনা সমালোচনার ঝড় বয়ে যায় বিজ্ঞানীমহলে। এর প্রতিক্রিয়া অভিশাপ না আশীর্বাদ হিসেবে সমাজে প্রতিফলিত হবে, তা নিয়ে নানা মত ব্যক্ত হয়। যাই হোক এই খবরটি ড. চৌবেকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। তার প্রমাণ আমি ওনার নোটবই ও ক্লিপিংস-এ পেয়েছি।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ খবরের কেন্দ্রবিন্দু হল সন্ডার্স অ্যান্ড ম্যাকেরন নামে একটি অধিজাতিক বীজ সংস্থা। এরা জিন প্রযুক্তির মাধ্যমে বীজে পরিবর্তন ঘটানোর জন্য কুখ্যাত। মহারাষ্ট্র সরকার তাদের কাছ থেকে তুলোর বীজ কিনে, বহু কৃষক পরিবারকে দেয়। প্রথম বছর পর্যাপ্ত ফলন হলেও দ্বিতীয় বছর থেকে ফলন কমতে থাকে। আরও মারাত্মক ব্যাপার হল ঐ বীজ থেকে যে সব গাছ উৎপন্ন হয়েছিল, তা থেকে নির্গত হয় এমন কিছু ক্ষতিকারক পদার্থ যা আশেপাশের ফসলের ক্ষতি করে। এর ফলে যে সব চাষিরা চিরাচরিত পদ্ধতিতে দেশিয় বীজ সংরক্ষণ করে ফসল উৎপন্ন করত, তাদের মারাত্মক ক্ষতি হল। তারাও তখন বাধ্য হল সন্ডার্স অ্যান্ড ম্যাকেরন উৎপাদিত প্রচন্ড দামি বীজ কিনতে। এই নিয়ে মহারাষ্ট্রে তুমুল গোলমাল হয়। যদিও প্রমাণের অভাবে ঐ বীজ সংস্থার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া যায় নি। মাঝখান থেকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছে বেশ কিছু কৃষক পরিবার।'

'দাঁড়ান দাঁড়ান' অধিকর্তা আগাসে হাত নেড়ে বললেন, 'এর সাথে চৌবের মৃত্যুর সম্পর্ক কি? একার্ড উইমারের পরীক্ষা আর তুলোর বীজ— দুটোর যোগসূত্র কোথায়?'

গভীর আত্মপ্রত্যয়ের হাসি সুরজিতের মুখে।

'আসছি স্যার' বললেন সুরজিৎ— 'পুরো গল্পটাই বলব। যা দেখেছি, যা বুঝেছি ও যা ভেবেছি তার তন্তুতে তন্তুতে বোনা। শুধু মিলছে না দেখলে ধরিয়ে দেবেন স্যার।'

'আপনি বলে যান'— ডা. পট্টনায়েকের উত্তেজনা চরমে উঠেছে। অন্যরাও তথৈবচ।

ছিন্ন সূত্র ধরে ফিরে আসেন সুরজিৎ—

'যাইহোক এই বীজ সংস্থার সাথে ইন্টারনেটের মাধ্যমেই যোগাযোগ শুরু হয় ড. চৌবের। এরও প্রমাণ আমার কাছে আছে। মিসেস চৌবের দেওয়া একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবৃতির সূত্র ধরে ও পুলিশের সাহায্যে তার পাশওয়ার্ড ক্র্যাক করে জানা গেছে ঐ সংস্থা থেকে নিয়মিত মোটা অঙ্কের চেক জমা হয়েছে ড. চৌবের নামে।

কিন্তু কেন সন্ডার্স অ্যান্ড ম্যাকেরন টাকা দিয়েছে চৌবেকে? বদলে কী দিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন তিনি?

এই গবেষণাগারে ড. চৌবে কাজ করছিলেন কটন লিফ কার্ল ভাইরাস বা সি. এল. সি. ইউ. ভি.-র উপর। তুলোগাছের পাতা কুঁকড়ে নষ্ট করে দেওয়া এই ভাইরাসের প্রতিষেধক বার করার চেষ্টায় ছিলেন তিনি। একার্ড উইমারের

আবিষ্কারের সূত্র ধরে তাঁর মনে হল, তিনিও তো বানাতে পারেন কোন সংকর ভাইরাস, যা বীজের মধ্যে দিয়ে ছড়িয়ে যেতে পারে বাতাসে, ক্ষতি করতে পারে অন্যান্য ফসলের। আর এই ভাইরাসের সত্ত্ব তিনি তুলে দিতে পারেন সন্ডার্স অ্যান্ড ম্যাকেরনের হাতে। বদলে পেতে পারেন অগাধ অর্থ যা দিয়ে অনায়াসে ক্রয় করা যাবে যশ ও প্রতিপত্তি।'

ডা. সহায় আঙ্গুল তুললেন— 'এক মিনিট। সন্ডার্স অ্যান্ড ম্যাকেরনের কাজকর্ম আমারও জানা আছে। ওরা জিনগত ভাবে পরিবর্তিত তুলোর বীজ বানায় যার নাম 'বাঁজা প্রযুক্তি।' একবার ফসল দেবার পর যার বীজ সংরক্ষণ করা যায় না। বছর বছর বীজ কিনতে হয়। কিন্তু সে গাছ ভাইরাস ছড়াবে কিভাবে?'

'পারে স্যার' সুরজিৎ বললেন— 'নিজেরা সেই ভাইরাসে আক্রান্ত হবে না, কিন্তু সাধারণ বীজ থেকে হওয়া গাছ ধ্বংস হয়ে যাবে। হয়তো মহারাষ্ট্রের কালো মাটিতে চাষিদের কান্নার এটাই কারণ।'

ড. নাম্বুদ্রি এতক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলে উঠলেন—

'সেন সম্পূর্ণ ঠিক বলেছে। এটা আজ প্রমাণিত সত্য—যদিও কোম্পানিগুলোকে হাতেনাতে ধরা যায় নি। এনিওয়ে প্লিজ ক্যারি অন...'

সুরজিৎ খেই ধরেন, 'ঐ উদ্ভিদের ভাইরাসের সংকরায়নের জন্য চৌবে বেছে নেন এবোলা ভাইরাসকে। জানতে পারিনি, কোথা থেকে তিনি এই ধারণা পেয়েছিলেন। অত্যন্ত প্রতিভাবান দীননাথ চৌবে নিশ্চয়ই কোনো সূত্র পেয়েছিলেন যে এবোলার জিন যদি ঐ তুলোপাতা ধ্বংসকারী ভাইরাসের মধ্যে প্রবেশ করানো যায়, তবে তৈরি হবে কাঙ্খিত সেই সংকর বা পরাগ যা কীটপতঙ্গের মারফৎ ছড়িয়ে পড়বে চারপাশের তুলো ক্ষেতে, ধ্বংস করে দেবে তার ফসল। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁর। ফ্র্যানকেনস্টাইনের জনকের মত তিনিও অজ্ঞাতসারেই জন্ম দিলেন এক দানবের যা প্রাণ হরণ করল স্রষ্টারই। কোনো অনিয়ন্ত্রিত জিনগত পরিবর্তন বা মিউটেশনই সম্ভবত এর জন্য দায়ী।'

সুরজিতের গলা ডুবে গেল নীরবতায়। ডা. আগাসে কিছু বলার জন্য একবার হাঁ করলেন। আবার মুখ বন্ধ করলেন। শেষে সর্বশক্তি দিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কিন্তু কিন্তু... এবোলার প্রাইমার বা জিন দীননাথ পেল কোথায়?'

হাসলেন সুরজিৎ। ক্লিষ্ট বিষন্ন হাসি। 'ইন্টারনেটে। আপনারা জানেনই ইন্টারনেট জিন ও জিন প্রযুক্তির বিশাল বাজার। ওনার পেনড্রাইভে আমি বেশ কিছু ওয়েবসাইট পেয়েছি, যারা আসলে এইসবের আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ী। দুটি ভাইরাসের নানা প্রাইমারের ছবি ও বহু ওভারল্যাপিং সিকোয়েন্সও ধরা আছে তাঁর পেনড্রাইভে।'

ডা. সেনের বক্তব্য শেষ হয় নি। 'এই সংকর ভাইরাসের বিশেষত্বগুলো আমি ভেবেছি। প্রথমত, শুধু মানুষকে সংক্রামিত করা— সেজন্য বাড়োয়া গ্রামের পশুপাখিরা মরেনি। দ্বিতীয়ত, অত্যন্ত স্বল্প সংক্রমণের সময় বা ইনকিউবেশন পিরিয়ড। যে জন্য মৃত্যু এসেছে ঝড়ের বেগে। তৃতীয়ত, এবোলার চেয়েও ভয়াবহভাবে এ আক্রমণ করে মানুষের শরীরের সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও তন্ত্রকে। আর চতুর্থত...'। 'কী চতুর্থত?' বলে উঠলেন কানোওয়ালজিৎ।

'অন্যান্য ভাইরাসের মত এটিও নির্দিষ্ট সময় পরে নিজে নিজেই নষ্ট হয়ে যায়, যাকে বলে অটোলিসিস। যত দ্রুত ছড়ায় ভাইরাসটি, তত দ্রুত নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল বলেই পরের দিন সাফাইকর্মিরা আক্রান্ত হননি। আমরাও পরীক্ষা করে কিছুই পাই নি। শুধু আক্রান্ত ব্যক্তির রক্তে রয়ে গিয়েছে অ্যান্টিবডি, যা এই রোগ প্রতিরোধের জন্য শরীরের শেষ নিষ্ফল চেষ্টা।'

৯

মন্ত্রমুগ্ধের মত সবাই শুনছিল ড. সেনের কথা। একটু বিশ্রাম নেবার জন্য তিনি থামতেই ড. পট্টনায়েক বললেন, 'কিন্তু বড়োয়া গ্রামে...' এবার মুখ খুললেন ইনস্পেক্টর গজেন্দ্র শর্মা, 'ল্যাবের নিয়মিত জমাদার রাজিন্দরের বদলি হিসাবে ঐ দিন ল্যাবে এসেছিল বড়োয়া গ্রামের রামপ্রসাদ। ওখানে ড. সহায় এই ল্যাবের একটা ভাঙা কালচার টিউব আবিষ্কার করেন। সম্ভবত ঐ রঙিন টিউবটা সে ল্যাব থেকে নিয়ে গিয়েছিল বোধহয় বাড়ির বাচ্চাদের খেলতে দেবে বলে।'

'রামপ্রসাদের নাম গবেষণাগারের কোনো খাতাপত্রে নেই। বদলি জমাদারদের দিন ভিত্তিতে ভাউচারে টাকা দেওয়া হত,' বললেন সুরজিৎ সেন, 'তাই প্রাথমিক তদন্তে বাড়োয়া গ্রামের গণমৃত্যু ড. চৌবের মৃত্যুর সঙ্গে সম্পর্কহীন বলে মনে হয়েছিল। কালচার টিউবটা পাবার পরে বিস্তারিত জিজ্ঞাসাবাদ করে খুঁজে রামপ্রসাদের খবরটা জানা যায়। আর এও বোঝা যায় যে এই সংকর ভাইরাসটি এবোলা ভাইরাসের মতো বাতাসের মাধ্যমে ছড়ায়। সম্ভবত বাচ্চাটির হাত থেকে পড়ে কালচার টিউবটি ভেঙে যায় আর বাতাসের মাধ্যমে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এই মৃত্যুদূত।'

বোধহয় এতক্ষণে বাকশক্তি ফিরে পেয়েছেন অধিকর্তা ড. আগাসে। ভীষণই চিন্তিতভাবে বললেন,' আবার এই ধরণের ঘটনা ঘটা কি সম্ভব, ড. সেন?'

মাথা নাড়লেন সুরজিৎ। 'রেকর্ড যেটুকু আছে তা থেকে বোঝা অসম্ভব কীভাবে এই সংকর ভাইরাসটি তৈরি করেছিলেন ড. চৌবে। আসল প্রযুক্তিগত কৌশলের পুরোটাই ছিল তাঁর মাথায়।'

'তার মানে, আবার এই ভাইরাস তৈরি করা অসম্ভব?' যেন কিছুটা স্বস্তি পেতে চান ড. আগাসে।

'তাই তো মনে হয়', কিছুটা দার্শনিকের মতো বললেন সুরজিৎ, 'যদি না আবার ড. চৌবের মত প্রতিভাবান বিজ্ঞানী এই ধরণের উন্নত গবেষণাগারে যোগ দেন এবং উচ্চাশা আর লোভ তাঁকে টেনে নিয়ে যায় বহুজাতিক সংস্থার অর্থভান্ডারের দিকে।'

'তবু ড. সেন', বললেন ড. আগাসে, 'আমার মনে হয় পেনড্রাইভের ঐ সামান্য তথ্যটুকুও নষ্ট করে দেওয়া হোক। কোথা থেকে কি হয়ে যায় কে জানে।' অনুমতির জন্য ড. নাম্বুদ্রির দিকে তাকালেন তিনি।

'ঠিক আছে ড. সেন, ঐসব তথ্য আপনি নষ্ট করে দেবেন। অবশ্যই তার আগে সমস্ত তথ্য ও ছবি সহ তৈরি করবেন একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট, যা কর্তৃপক্ষকে দিতে হবে। ড. চৌবের ল্যাব আপাতত সিল করাই থাকবে যতক্ষণ না সম্পূর্ণভাবে নির্বীজকরণ করা হয়। আর অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে। আপনার জন্য কেন্দ্রিয় সরকারের কাছে আমাদের মুখ রক্ষা হল।' সুরজিতের পিঠ চাপড়ে দরজার দিকে পা বাড়ালেন ড. নাম্বুদ্রি।

১০

কে? এই প্রশ্নটা কুরে কুরে খাচ্ছে সুরজিৎ সেনকে। ড. চৌবে? নাকি বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত এই সব প্রযুক্তি? নাকি বহুজাতিক অথবা অধিজাতিক সংস্থাগুলির বিবেকহীনতা! কে এই মৃত্যুযজ্ঞের ঋত্বিক? নিজের ল্যাপটপে আবার ড. চৌবের পেনড্রাইভ

লাগালেন সুরজিৎ। মানসচক্ষে দেখতে পেলেন দিনরাতের চেষ্টায় এক বিজ্ঞানী ডাউনলোড করছেন তথ্যের পর তথ্য। ভাবছেন, সাজাচ্ছেন যুক্তিজাল, লিখছেন, আবার খুঁজছেন নতুন প্রযুক্তি। স্বপ্ন, মেধা, শ্রম একাকার হয়ে যাচ্ছে সৃষ্টিসুখের উল্লাসে। এই প্রতিটি স্বপ্ন যেন এক প্রতিভাবান বিজ্ঞানীর উল্লাসের স্বাক্ষর। নিজে একজন বিজ্ঞানী হয়ে তিনি কি করে...

নাঃ, কল্পনাপ্রবণ হয়ে কোন লাভ নেই। মনকে শক্ত করতে হবে। চশমার কাঁচ মুছে শেষবারের মত মনিটরের দিকে তাকালেন সুরজিৎ।

যেন বলতে চাইলেন, 'ড. চৌবে, আপনার সঙ্গেই শেষ হয়ে যাক আপনার আহৃত সকল তথ্য। জ্ঞান, যা যুগে যুগে প্রবাহিত হবার কথা, আজ তার অন্যথা হোক। ধ্বংস হোক, লুপ্ত হোক এই প্রযুক্তি, যা মানুষের অনিষ্ট করে।' অবশ্য এসব কথা তিনি উচ্চারণ করলেন না। স্বগতোক্তির মত শুধু বলে উঠলেন, 'ডিলিট, ডিলিট, ডিলিট।'

লেখক পরিচিতি ঃ ডা. সিদ্ধার্থ গুপ্ত প্যাথোলজি ও বায়োকেমিস্ট্রি বিশেষজ্ঞ, প্রাবন্ধিক ও সাহিত্যিক।

With Best Compliments from

INTAS PHARMACEUTICALS LTD.
ILTIMA DIV.

হস্‌পিটাল ঃ প্রণয় পাশে চিকিৎসক

অংশুমান ভৌমিক

'এই সুন্দর স্বর্ণালী সন্ধ্যায়/ একি বন্ধনে জড়ালে গো বন্ধু/ কোন রক্তিম পলাশের স্বপ্ন/ মোর অন্তরে ছড়ালে গো বন্ধু।' ব্যস! এইটুকু লিখলেই **স্বাস্থ্যের বৃত্তে**-র পাঠক বাকিটা গুনগুনিয়ে নেবেন। গ্রামোফোনের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত যে সব গান আমাদের কালেকটিভ আনকনশাসে পাকাপাকি ভাবে গেঁথে গেছে তার ফর্দ বানাতে বসলে এই গানখানা টপ টেনে থাকবে। পাঁচ দশকের পুরানো গান। খুব সাদামাটা কথা নয়। যুক্তব্যঞ্জনে থিকথিক করছে। জিভের ডগায় গড়িয়ে যাবার সম্ভাবনা প্রবল। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের কথায় কি জাদু ছিল আর অমল মুখোপাধ্যায়ের মীড়ের দোলায় কি মায়া ছিল জানি না। গীতা দত্তের গলায় আর গায়কিতে দুটোই ছিল। আর তাতেই হাফ সেঞ্চুরি। একটা গান যে একটা ছবিকে কোন উচ্চতায় তুলে নিয়ে যেতে পারে এবং শেষমেশ ছাপিয়ে যেতে পারে, তার উৎকৃষ্ট নমুনা। না বলে দিলে আমরা ভুলেই থাকি যে ছবিটার নাম *হস্‌পিটাল*।

এমনিতে রোমান্টিক কমেডি। স্বপ্ন হল সত্যির গতে বাঁধা। প্রেমিক-প্রেমিকার নিবিড় আলিঙ্গনে যার পরিসমাপ্তি। তবু এই হস্‌পিটাল ছবিটাকে ডিসেকশন টেবিলে আনতে হচ্ছে, কারণ পয়লা নম্বর কারণ হস্‌পিটালের নায়ক-নায়িকা দুজনেই ডাক্তার। দুসরা কারণ, ছবির প্রেক্ষাপট স্বাস্থ্যপরিষেবা। এমন হর-গৌরী মিলন বাংলা সিনেমায় বড়ো একটা ঘটেনি।

শ্রী এন সি প্রোডাকশনের *হস্‌পিটাল* ১৯৬০ সালের ছবি। একই বছরে ঋত্বিক কুমার ঘটকের *মেঘে ঢাকা তারা*-য় আচ্ছন্ন কলকাতা। মৃণাল সেনের *বাইশে শ্রাবণ* বেরোচ্ছে। বাংলা সিনেমায় রাজসমারোহে প্রবেশ করছে নব্যবাস্তববাদ। আর মুকুটমণিপুরের প্রমোদতরীতে অশোককুমারের বক্ষলগ্না সুচিত্রা সেনের ছবিকে সামনে রেখে *হস্‌পিটাল* বেরোচ্ছে পূজোর মুখে। ১৬ সেপ্টেম্বর মিনার-বিজলি-ছবিঘর চেইনে। ছবি হিসেবে হস্‌পিটাল হলিউডি ঘরানার মেলোড্রামা। তবে গল্পটা লিখেছিলেন নীহার রঞ্জন গুপ্ত মশাই। তাঁর উপন্যাসকে সিনেমার মাপসই করে দিয়েছিলেন চিত্রনাট্যকার জ্যোর্তিময় রায়। *হস্‌পিটাল* পরিচালনা করেছিলেন সুশীল মজুমদার।

মজুমদার মশাই টালিগঞ্জ ফিল্ম ইনডাস্ট্রিতে লম্বা রেসের ঘোড়া। ৩৭ বছরের পরিচালক জীবনে ২৮ টা ছবির কান্ডারী। এখন যে ধরনের ছবির গায়ে মেইনস্ট্রিম সিনেমার লেবেল সেঁটে দিই আমরা, সেই ধরনের ছবিতে সিদ্ধহস্ত। ১৯৩২ সালে প্রমথেশ বড়ুয়া সাহেব যখন চলচ্চিত্র প্রযোজনায় হাত পাকাচ্ছেন তখন *একদা* নামে একটা সিনেমা হয়েছিল সুশীল মজুমদারের পরিচালনায়। সেই শুরু। স্বাধীনতার আগে অবিভক্ত বাংলায় সিনেমার রমরমার জামানাতে ফি বছরে একটা ছবি বাঁধা ছিল তাঁর। ১৯৪৮ সালে তুলসী লাহিড়ীর গল্প থেকে *সর্বহারা* বানিয়েছিলেন। সম্ভবত উদ্বাস্তু সমস্যা ও নগরায়নের সংকট নিয়ে সেটাই প্রথম বাংলা ছবি। ছবিটা চলেনি। এখন বোধহয় হারিয়েই গেছে। কখনও পাওয়া গেলে মজুমদার মশাইকে অন্য চোখে দেখতে হবে। পঞ্চাশ-ষাটের দশকের যে বাংলা ছায়াছবির জন্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত আজও নস্ট্যালজিয়ায় ভোগে, মজুমদার মশাই সে আমলেও সিনেমা পাড়ায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন। সাহিত্যধর্মী ছবি বানাচ্ছেন। হরেকরকম ব্যানারে কাজ করছেন। অহীন্দ্র চৌধুরী-ছায়া দেবী থেকে উত্তমকুমার-সুচিত্রা সেন— হেন নায়ক-নায়িকা নেই, অভিনেতা নেই যিনি তাঁর কৃপাদৃষ্টি পাননি। উত্তম-সাবিত্রী জুটির *শুকসারী* (১৯৬৯) তাঁর শেষ ছবি।

হস্‌পিটাল তাঁর জনপ্রিয়তম ছবি।

এ ছবির টাইটেল সিকোয়েন্সেই চমক ছিল। এক্স-রে ভিউয়ারে বুকের খাঁচার ছবির প্রোজেকশন। তার ওপর দিয়ে ভেসে উঠল ছবির টাইটেল। *হস্‌পিটাল*। তারপর একটার পর একটা স্লাইড প্রোজেকশন। তাতে কলাকুশলীদের পরিচিতি। আর ফ্রেমের আশেপাশে স্টেথোস্কোপের নল থেকে শুরু করে ফরসেপস প্রভৃতি শল্যচিকিৎসার প্রয়োজনীয় শস্ত্র।

এই ধরনের চিহ্ন আর চিহ্নের মধ্যস্থতায় দক্ষিণ কলকাতার রইস মহল্লায় ব্যারিস্টার বোসের (কমল মিত্র) বসতবাড়ির ভেতরে ক্যামেরা ঢুকে পড়ে অশোককুমার ওরফে ডা. শৈবাল বোসকে আবিষ্কার করার আগেই *হস্‌পিটাল* ছবির চরিত্র সম্পর্কে একটা আবছা ধারণা হয়ে যাচ্ছে দর্শকদের। পর্দায় দেখতে পাচ্ছি খানসামা, চাপরাশিদের। ব্রেকফাস্ট টেবিলে ইংরেজি-বাংলায় পিতা-পুত্রের দোআঁশলা বাতচিতে উঠে আসছে পেশাগত ব্যস্ততার প্রসঙ্গ। পিতা মামলা মকদ্দমা নিয়ে জেরবার। পুত্রটিও তথৈবচ। এদিকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সার্জেনের শ্রমসাধ্য কাজ, অন্যদিকে উচ্চতর শিক্ষার প্রস্তুতি। এ জগতে নারীর কোনো ভূমিকা নেই।

হাসপাতালে ঢুকে চিনে নেওয়া যায় ডা. শর্বরী রায় (সুচিত্রা সেন)-কে। কায়স্থতনয় শৈবালের বাগদত্তা এই ব্রাহ্মণতনয়ার পিতা বর্তমানে পঙ্গু। দেড়শো টাকা পেনশন আর হাসপাতালের সামান্য অ্যালাউন্সে কোনো রকমে দিন গুজরান। হাড় জিরজিরে পরের বাড়ির ভাড়া গুনতে গুনতে ছেলেমেয়েদের ইস্কুল-কলেজের মাইনে বাকি পড়ে যায়। নিজের গাড়িতে শর্বরীকে বাড়ি পৌঁছে দিতে এসে শৈবাল বলে, 'আর কতদিন তোমাকে এইভাবে বাড়ির দরজায় নামিয়ে দিতে হবে বলো তো?' শর্বরী জানে তাঁর বাবা কিছুতেই অসবর্ণ বিবাহে মত দেবেন না। অপেক্ষা করতে বলে শৈবালকে। আর উপায় না দেখে হাসপাতালে এসে সাংসারিক অভাব-অনটনের কথা মাস্টারমশাই ডা. নির্বাণ চৌধুরি (সুশীল মজুমদার)-কে জানায়। অকৃতদার মানুষটা নানান প্রাইভেট কলে শর্বরীকে নিয়ে যেতে শুরু করেন। তাকে নানান রকম দায়িত্ব দিতে থাকেন। ভবানীপুরে একটা অপারেশনে ডা. চৌধুরিকে অ্যাসিস্ট করে ৪০০ টাকা পেয়েছিল শর্বরী। সে তো চমকে ছিলই, এই দৃশ্য দেখতে দেখতে আমাদেরও চোখ কপালে উঠেছিল। ৫০ বছর আগে অ্যাসিস্ট করে এক দিনেই ৪০০ টাকা! আজকের দিনে হাসতে হাসতে ১০ হাজার ছাড়িয়ে যাবে! প্রাইভেট প্র্যাকটিসে পসার হলে সে আমলে ডাক্তারবাবুদের রোজগারপাতি কী রকম হত তার একটা মহাজাগতিক ধারণা দিচ্ছে হস্‌পিটাল। সারাদিন ওয়ার্ডে ডিউটি করার পর বিকেল বেলায় ডা. চৌধুরিকে অ্যাসিস্ট করতে গিয়ে অর্থাগম ভলোই হল শর্বরীর। শবরীর দশা হল শৈবালের।

একদিন ট্যাঙ্কে পেট্রোল ভরে পার্ক

নার্সিংহোমের সামনে থেকে প্রেয়সীকে গাড়িতে তুলল সে। লং ড্রাইভের চাকা গড়াল দিকশূন্যপুরের দিকে। খানিক বাদে আমরা দেখলাম মুকুটমণিপুরের মতো কোনো একটা পাহাড়ে ঘেরা হ্রদে তরণীভ্রমণ করছে ক্রৌঞ্চমিথুন। শৈবাল আংটি পরাল শর্বরীর অনামিকায়। আর গীতা দত্তের প্লেব্যাকে ভেসে এল 'এই সুন্দর স্বর্ণালী সন্ধ্যায়'। মদির হয়ে এল নায়িকার দৃষ্টি। নায়কের বক্ষলগ্ন হল সে। ক্লোজ শট আর লং শট হাত ধরাধরি করে চলতে চলতে নেমে এল রাত। এবার কলকাতায় ফিরতে হবে। আর এর পরেই সেই মধুর অঘটন। গাড়িতে স্টার্ট দিতেই বোঝা গেল পেছনের চাকার টায়ার পাংচার হয়ে গেছে। সঙ্গে স্টেপনি নেই। মোটর মেকানিকের হদিশ মিলতে মিলতে আরও মাইল দুয়েক। বনবাংলোর কেয়ারটেকার জানাল, একটা ঘর খালি আছে। একটাও কথা না বাড়িয়ে গাড়ি থেকে নেমে বাংলোর পথে পা বাড়াল শর্বরী। হতভম্ব শৈবাল।

পরের দৃশ্যটা অসাধারণ। কলকাতায় ফিরছে প্রেমিক যুগল। এবারে প্রেমিকার চোখের ভাষা বদলে গেছে। অনেক বেশি অনুরাগ নিয়ে প্রেমিকের দিকে চেয়ে আছে সে। অনেক গভীর বাণী খেলে যাচ্ছে তার চোখের তারায়। বেজে উঠছে ভায়োলিন অর্কেস্ট্রা। সুরটা আমাদের চেনা চেনা। 'ওরে ভাই আগুন লেগেছে বনে বনে।' ওহ! এমন প্রাপ্তমনস্ক অভিব্যক্তিতে ভরপুর হয়ে প্রি-ম্যারাটাইল সেক্স বাংলা সিনেমায় এসেছে? মনে পড়ে না।

ক মাস পর জানা গেল শর্বরী অন্তঃসত্ত্বা। নিজে গাইনোকলজিস্ট শর্বরী কী করে এতদিন ধরে গর্ভসঞ্চারের সম্ভবনাকে ভুলে থাকল সে প্রশ্ন আমাদের মনে আসবে। আসবেই। শৈবালের মনে আসেনি। ম্যারেজ রেজিস্ট্রি অফিসে গিয়ে নোটিশ সই করে এসেও তার কাছে বড় হয়ে উঠেছে লোকলজ্জার প্রশ্ন। রসাল কানাকানি আর জানাজানির আশঙ্কা। থাকতে না পেরে শর্বরী শুধিয়েছে, 'এই অনাগত সন্তান তোমার কাছে অবাঞ্ছিত?' উত্তেজিত শৈবাল বলেছে, 'নিশ্চয়।' আরও বলেছে গর্ভপাতের কথা। রাজি হয়নি শর্বরী। চোয়াল শক্ত করে শৈবালের কাছ থেকে দূরে সরে গেছে। যাবার আগে বলে গেছে, 'আমার সন্তান আমার নাম নিয়ে সমাজে মাথা উঁচু করে থাকবে। তোমার পরিচয়ের অসম্মান নিয়ে তার বেঁচে না থাকাটাই ভলো!'

বাদ বাকি গল্প খুব কম কথায় বলে দেওয়া যায়। কলকাতা ছেড়ে কয়লাখনি এলাকায় একটা নার্সিংহোমে কাজ নেয় শর্বরী। সেখানকার সদাশয় ডাক্তারবাবু বিজন সাহা (পাহাড়ী সান্যাল) তাকে স্নেহ করলেও কোলিয়ারির মালিকের উৎপাত বাড়তে থাকে। সে অন্তঃসত্ত্বা এটা লোক জানাজানি হতে উৎপাত আরও প্রকট হয়। শেষ পর্যন্ত মানসম্ভ্রম বাঁচিয়ে শিমুলতলায় আশ্রয় নেয় শর্বরী।

এই সময় তারকা লাঞ্ছিত প্রেমিক যুগলকে মেলাতে প্রজাপতির নির্বন্ধ করেন দুই ডাক্তারবাবু। বাড়িতে ডেকে এনে ডা. নির্বাণ চৌধুরি ছাত্র তথা সহকর্মি শৈবালের সঙ্গে কথা বলেন—

নির্বাণঃ তুমি ভুল করছ শৈবাল! অন্যায় করছ! অমন একটা প্রস্তাব করার আগে শর্বরীর মনটা তোমার বুঝে নেওয়া উচিৎ ছিল।

শৈবালঃ ডাক্তার হয়েও এ বিষয়ে সংস্কার তার (শর্বরীর) এত গভীর আমি ভাবতেও পারিনি।

নির্বাণঃ ডাক্তার বলতে তুমি নিশ্চয়ই তুমি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলছ শৈবাল! কিন্তু সত্যিকারের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি উদ্বুদ্ধ করবে প্রাণ দিতে, নিতে নয়।

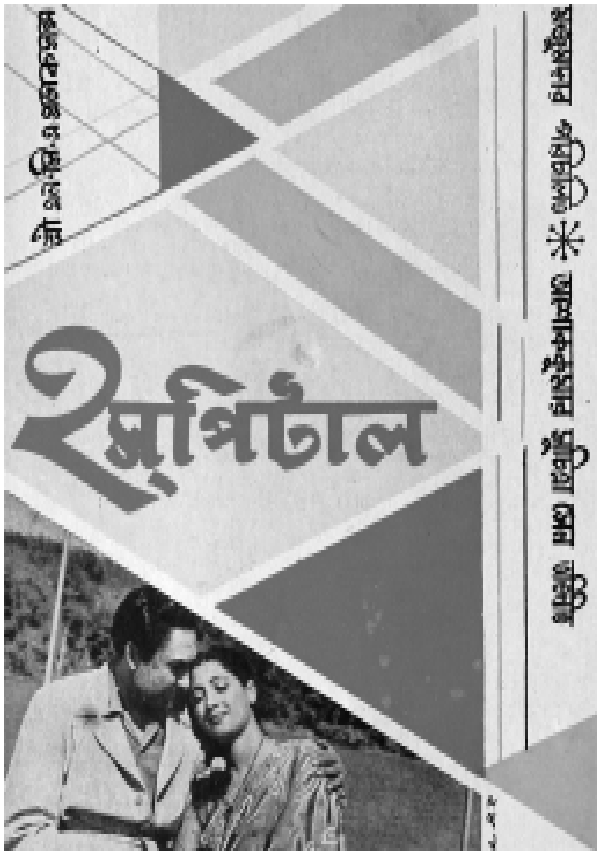

ততদিনে নিউ ওম্যানের চরিত্রলক্ষণ স্পষ্ট হচ্ছে শর্বরীর মধ্যে। শৈবালের কোনো রকম উদ্যোগই তাকে সংকল্প থেকে টলাতে পারে নি। শিমুলতলাতেই তার ছেলে হয়। গৌতম। জন্মের অনেক আগে থেকেই শর্বরীর কথায় বার্তায় আমরা টের পাচ্ছিলাম তার ছেলে হবে। তখন কি গর্ভস্থ শিশুর লিঙ্গ নির্ধারণ সম্ভব ছিল? নাকি বৈধ ছিল? দুটো জিজ্ঞাসারই উত্তর নেতিবাচক। আমরা *হস্পিটাল*-কে এ যাত্রায় মাপ করে দিই। হতাশ শৈবাল বিলেতে উড়ে যায়।

এদিকে ছেলে গৌতম বড় হতে থাকে। কয়েক বছর বাদে মুম্বইতে ডা. বিপ্রদাস ঘোষাল মশাইয়ের (ছবি বিশ্বাস) নার্সিংহোম থেকে শর্বরীর চাকরির অফার আসে। মাসে ৫০০ টাকা মাইনে। সঙ্গে থাকা-খাওয়া। এরই মধ্যে কানে আসে এফ আর সি এস, এম আর সি পি পাশ করে দেশে ফিরেছে শৈবাল। কাগজে পড়ে নিজের নার্সিংহোম বানিয়ে খুব কম পয়সায় গরিব দুঃখীদের ক্যান্সার চিকিৎসার বন্দোবস্ত করছে সে। ডা. ঘোষালও গরিব দুঃখীদের জন্য চিকিৎসার কথা তোলেন। সাধনামগ্ন থাকেন ল্যাবরেটরিতে। মৌলিক গবেষণার কাজে। একদিন শর্বরীকে বলেন, 'চুলোয় যাক, গোল্লায় যাক নার্সিংহোম। কতকগুলো পয়সাওয়ালা লোকের দুদিনের অসুবিধা তো! হ্যাং দেম! লেট দেম সাফার! নার্সিংহোম আমি তুলে দেব। কি হবে নার্সিংহোম দিয়ে যেখানে গরিব লোকের কোনো সুবিধা হয় না! তার চেয়ে আমি চ্যারিটেবল হসপিটাল করব। সেখানে অন্তত কিছু লোক বিনা পয়সায় চিকিৎসা পাবে!'

আমরা অবাক হয়ে যাই। এতদিন আগে এত প্রতিষ্ঠিত ডাক্তারবাবু সরকারি স্বাস্থ্যপরিষেবার বাইরে থেকে একটা বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিকাঠামো গড়ে তোলার কথা ভাবছেন? ভেবেছেন, নাকি

তাদের দিয়ে সাধারণ খেটে খাওয়া মধ্যবিত্তের সাধ-আহ্লাদ মেটাতে চেয়েছেন হস্‌পিটাল নির্মাতারা? আজ বেসরকারি নার্সিংহোমের মৌরুসিপাট্টা দেখে মনে হয় একটু বেশি বেশিই করে ফেলেছিলেন চিত্রনাট্যকার জ্যোর্তিময় রায়।

ছবির শেষে ফুসফুসের ক্যান্সারে আক্রান্ত শর্বরীর চিকিৎসার দায়িত্ব বর্তায় শৈবালের ঘাড়ে। মুম্বই থেকে এয়ার লিফ্‌ট করে তাকে কলকাতায় আনা হয়। অপারেশন মোটের ওপর ফলপ্রসূ হয়। গভীর রাতে পেশেন্টের পোস্ট-অপারেটিভ কেয়ারের সময় ক্রমাগত ধূম্র উদ্‌গীরণ করে চলে শৈবাল। এক সময় শর্বরীর জ্ঞান ফেরে। চারহাত এক হয়। মধুরেণ সমাপয়েৎ হয়।

দুঘন্টার এই ছবি দেখতে দেখতে আমাদের মধ্যে কয়েকটা ব্যাপার দাগ কেটে যায়। আমাদের ভাবিয়ে তোলে। এ ছবির কেন্দ্রবিন্দুতে নরনারীর মানবিক প্রেম থাকলেও প্রেক্ষাপট ডাক্তার-ডাক্তারি-হাসপাতাল-নার্সিংহোম হওয়ায় হস্‌পিটাল-কে আমাদের অন্য চোখে দেখতেই হয়। এই প্রেমের পথে যে কাঁটা আছে তা নিতান্তই সামাজিক সংস্কার। বামুনের ঘরের মেয়ে কি করে কায়েতের ঘরের ছেলের গলায় মালা পরাবে, এটাই এ ছবির আদত গোলমালের জায়গা। ডাক্তার হবার সঙ্গে মনের প্রসারতার একটা আলগা সম্পর্ক আছে। তাও পিতৃ-পুরুষের মতকে শিরোধার্য করেই এগোতে হয় নায়ক-নায়িকাকে। সমাজের সঙ্গে ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার চিরন্তন সংঘাত তাদের বিচ্ছেদ ঘটায়। অনাগত সন্তানের মঙ্গলের চেয়ে নায়ক শৈবালের কাছে বড় হয়ে ওঠে সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও কলঙ্কের ভ্রূকুটি। আর এসবের পরোয়া না করে নিরুদ্দেশের পথিক হয়ে ওঠে নায়িকা শর্বরী। দূরত্ব বাড়তে থাকে। প্রেম থেকে যায়। মুশকিলটা হয় শেষ পর্বে। মুম্বইতে শিশুপুত্র গৌতমকে ভরতি করতে গিয়ে পিতৃপরিচয়ের সংকট তৈরি হয়। এতদিন ধরে সিঙ্গল মাদার অস্তিত্বে সড়গড় হয়ে উঠেও ইস্কুলে পাঠানোর প্রশ্নে অসংবেদনশীল সমাজের কাছে মাথা নত করতে হয় শর্বরীকে। সে উপলব্ধি করতে থাকে যে কিছুতেই সন্তানকে তার পিতার পরিচয় ও নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত করা উচিত হচ্ছে না। যে অস্মিতা নিয়ে সে শৈবালকে একরকম প্রত্যাখ্যানই করেছিল, ছবির শেষে তা ধুয়েমুছে সাফ হয়ে যায়। কেউ কারুর কাছে নতজানু হয় না বটে, কিন্তু পুরুষতন্ত্রের কাছে নিউ ওম্যানের পরাভব সম্পূর্ণ হয়। কিছুতেই *হস্‌পিটাল*-কে নারীর ক্ষমতায়নের বিজ্ঞাপন হিসেবে দেখা সম্ভব হয় না। ডাক্তারির মতো আপাত ভাবে মর্যাদাসম্পন্ন ও প্রগতিশীল পেশার সঙ্গে জড়িয়ে থেকেও আপোসে যেতে হয় শর্বরীকে।

এ তো গেল গল্পের কথা। নির্মাণের দিক থেকেও অসংখ্য অসঙ্গতি আছে ছবিটায়। সমান্তরাল ধারার আর্টহাউস সিনেমায় মানব সম্পর্কের জটিলতাকে যত সহজ-সরল আর বোধগম্য করে প্রকাশ করা যায় এ ছবিতে তার সুযোগ নেই। কিন্তু যা আছে তা দিয়ে ডাক্তারবাবু ও ডাক্তারদিদিমণিদের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে অনেক কিছু বুঝে নেওয়া সম্ভব। বিশেষ করে সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে। *হস্‌পিটাল*-এ ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় একটা ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। ডা. সেন। এই মানুষটা কাঠ বাঙাল। পেশায় প্যাথোলজিস্ট। আর পাঁচজন সরকারি কর্মির মতো এনারও কাজ করতে খুব অনীহা। আর কথায় কথায় কাজ করে উদ্ধার করে দেবার ঘোষণা। রোগী বাড়ছে দেখে তাঁর বিরক্তিও বাড়ছে। হাসপাতাল জনসাধারণের জন্য এ বোধ টনটনে। তবু কর্তব্যের সীমারেখাটুকু বুঝে নিতে তাঁর আগ্রহের অবধি নেই, পাছে বেশি কাজ করে ফেলেন তার জন্য সতর্ক থাকেন।

এমন মানুষের পাশাপাশি আছেন ডা. চৌধুরির মতো অকৃতদার যাঁর জীবনে রোগীর প্রয়োজনের চেয়ে বড়ো প্রয়োজন আর নেই। আছেন ডা. ঘোষ যিনি কোলিয়ারি মালিকের হাজার গাফিলতি সত্ত্বেও মাটি কামড়ে তেঁতুলিয়াতে পড়ে আছেন। বা ডা. ঘোষাল যিনি মুম্বইয়ে ভালো স্বাস্থ্যব্যবসা জমালেও মাঝে মাঝেও আম আদমির কাছে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের সুফল নিয়ে যেতে চান। পারেন না বলে হাত কামড়ান। মুম্বইতেই পাচ্ছি ডা. মেহেতাকে যিনি অবলীলায় বয়সে অনেক ছোটো ডা. বসুকে অ্যাসিস্ট করতে রাজি হয়ে যান, মুম্বই থেকে ফ্লাইটে চড়ে শর্বরীকে কলকাতায় উড়িয়ে আনেন। আর আছেন শৈবাল বসু যিনি বিলেত ফেরতা প্রাইভেট প্র্যাকটিস না জমিয়ে গরিবদের জন্য অল্প পয়সায় স্বাস্থ্য পরিষেবা দেবার ব্রত নিয়েছেন। ডাক্তারবাবুদের মধ্যেকার এই সুন্দর বোঝাপড়া আমাদের নজর এড়ায় না।

ছবি হিসেবে *হস্‌পিটাল* বাণিজ্যিক সাফল্য পেয়েছিল। এখনও তা আকর্ষণীয়। কারণ যে ডাক্তারবাবুরা এ ছবির পনের আনা জুড়ে আছেন তাঁদের আর আমাদের আশেপাশে দেখা যায় না। দেখা গেলেও এঁরা এত নগণ্য যে হিসেবে আসেন না। আজ আর বিলেত থেকে ডাক্তারি ডিগ্রি পেলে খবরের কাগজে নিউজ আইটেম হয় না। আজ আর অক্লেশে কলকাতা ছেড়ে গ্রাম-গঞ্জে সেবাব্রতধারী চিকিৎসকের দেখা মেলে না।

তাই *হস্‌পিটাল* আমাদের চোখের সামনে একটা আদর্শ স্বাস্থ্য পরিকাঠামো ও সেবা মানসিকতার পরাকাষ্ঠা হয়ে থেকে যায়। নরনারীর প্রেমের চেয়ে তা কোনো অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। সেদিনও ছিল না, এদিনও নয়।

লেখক পরিচিতিঃ অংশুমান ভৌমিক— শিক্ষক, সাংবাদিক ও শিল্প-সমালোচক।

কুইজের উত্তর

১. ৪ জোড়া। ম্যাক্সিলারি (Maxillary), ফ্রন্টাল (Frontal), ইথময়েড (Ethmoid) ও স্ফিনয়েড (Sphenoid) হাড়ে। ২. ফ্যানকনি সিন্ড্রোম। ৩. I Q, ২৪ এর নিচে। ৪. থ্যালিডোমাইড। ৫. সংক্রমণযুক্ত জল, খাবার খেলে এমনকি রোগীর সংস্পর্শে আসার পরে ঠিক মতো হাত না ধুয়ে খেলে হয়। জীবাণু রোগীর মলের মধ্যে নির্গত হয় আর তার থেকেই অন্য জিনিসে সংক্রমণ ঘটে। একে Faeco-oral transmission বলে। ৬. ক্যাপোসি'স সারকোমা (Kaposi's Sarcoma)। ৭. ডোপামিন। ৮. আয়রন বা লোহা। ৯. কোলোস্ট্রাম ১০. স্ট্যাফাইলোকক্কাস অরিয়াস। ১১. ৪-৫ মাস বয়েসের মধ্যে। ১২. ব্যাগাসোসিস। ১৩. গ্রুপ A স্ট্রেপ্টোকক্কাস। ১৪. হেনরি ডুনাল্ট, ১৮৫৯ সালে ইতালির 'সলফেরিনো যুদ্ধ'-র দৃশ্যে অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে সেবার কাজ শুরু করেন। ১৮৬৪ সালে এই সংস্থার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৫. ''১৯৭৫-র সিগারেট আইন'' অনুযায়ী ১৯৭৬ সালের ১লা এপ্রিল থেকে।

বই পড়া

সত্য শিবরামন

দ্য আর্ট অ্যান্ড সায়েন্স অফ হীলিং সিন্স অ্যান্টিকুইটি। দয়ারাম বর্মা, এম ডি, পি এইচ ডি। প্রকাশক (Xllrris), প্রথম প্রকাশ ২০১১।

একটি বিষয়ের উপর সমস্ত ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন দিক থেকে সংশ্লেষ করে বই বেরোয় কালেভদ্রে, আর এই রকম বইয়ের প্রবল অর্ন্তদৃষ্টি আমাদের বহুদিন ধরে চলে আসা প্রায় সমস্ত সন্দেহগুলির অনেকটা সমাধান এক ধাক্কায় করে দেয়। চিকিৎসার জগতের বাস্তবটা যে ঠিক কি রকম সে নিয়ে আপনি যদি ধাঁধায় পড়ে গিয়ে থাকেন, তবে অধ্যাপক দয়ারাম বর্মার দ্য আর্ট অ্যান্ড সায়েন্স অফ হীলিং সিন্স অ্যান্টিকুইটি বইটি আপনার জন্য অবশ্যপাঠ্য। অধ্যাপক বর্মা কানাডার ম্যাকগিল ইউনিভার্সিটির ভেষজবিজ্ঞানের অধ্যাপক, আবার তিনি সামাজিক আন্দোলনের একটি চেনা মুখ।

এই বইয়ে আপাত-সরল আলোচ্য বিষয় হল— চিকিৎসার ক্ষেত্রে কেন এত আলাদা পরস্পর যোগসূত্রবিহীন 'সিস্টেম' বা 'প্যাথি' আছে? আধুনিক চিকিৎসা থেকে পুরনো ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা কি করে পাশাপাশি নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখছে? অথচ বিজ্ঞানের অন্য সব শাখাতে বিজ্ঞানীরা নিজেদের মধ্যে একমত হয়ে জ্ঞান ও পদ্ধতির একটিমাত্র ধরন নির্মাণ করেছেন। প্রফেসর বর্মা যেমন বলেছেন, ''চৈনিক, হিন্দু, মুসলমান বা ইউরোপীয় পদার্থবিজ্ঞান বা রসায়ন বলে কিছু নেই। তাহলে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কেন আয়ুর্বেদ, চৈনিক, হোমিওপ্যাথিক ইত্যাদি আলাদা ঘরানা?''

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখাতেই কিছু বিতর্ক ও মতানৈক্য রয়েছে, কিন্তু তাদের কোনোটাই চিকিৎসাবিজ্ঞানের মতো এত প্রবল ও বহুমুখী নয়। মানব শরীরের প্রকৃতি, রোগের কারণ, বা চিকিৎসার পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা, এ সবগুলোই চিকিৎসাবিদ্যার বিভিন্ন 'সিস্টেম' বা 'প্যাথি'-তে পুরোপুরি আলাদা। এবং বৃহত্তর সমাজে প্রতিটি সিস্টেমের নিজস্ব স্থান রয়েছে, রয়েছে অনুগত ভক্ত-অনুরাগীবৃন্দ। কিন্তু আধুনিক চিকিৎসায় ('অ্যালোপ্যাথি' নামক ভুল নামে যে সিস্টেমটি বেশি পরিচিত) ডাক্তার রোগীকে যেভাবে দেখেন তার সঙ্গে আয়ুর্বেদ বা হোমিওপ্যাথ চিকিৎসকের রোগী দেখার মৌলিক তফাৎ রয়েছে।

বইটি পড়তে গিয়ে আমরা দেখি অধ্যাপক বর্মার সহজ প্রশ্নের উত্তর খোঁজা মোটেই সহজ নয়।

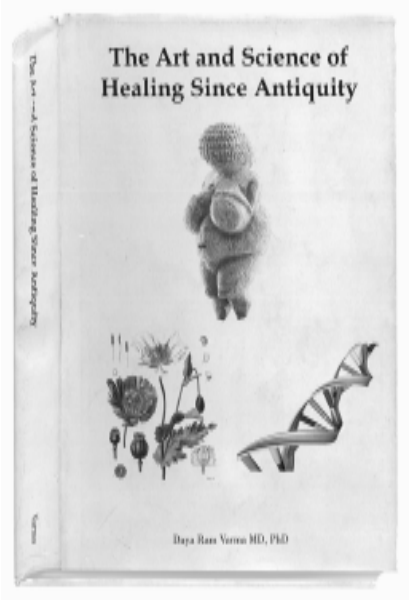

শুরুর কথা বোধ করি এইটা যে, মানুষের জীবন-মরণ নিয়ে চর্চা করে যে বিদ্যা সেটি মানুষের চর্চিত সমস্ত বিষয়গুলির মধ্যে সুনিশ্চিতভাবেই জটিলতম। অধ্যাপক বর্মা বলছেন, পদার্থবিদ্যা বা রসায়নের মতো যেসব প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, তাদের তুলনায় জীবদেহের সংগঠন অনেক জটিল বিষয়; ফলে তাতে পদার্থবিদ্যা বা রসায়নের মতো নিখুঁতভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। সুতরাং মানবদেহের বহু রহস্য এখনও অধরা। রোগ পুরো সারানো তো দূরের কথা, ডায়াবেটিস, ক্যান্সার বা এমনকি উচ্চ-রক্তচাপের কারণও আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান পুরো বলতে পারে না, সুতরাং আধুনিক চিকিৎসার প্রতিদ্বন্দ্বী চিকিৎসাব্যবস্থাগুলির তরফে পাল্টা সাফল্যের দাবী করার ও 'বিকল্প' চিকিৎসার সুযোগ থাকে।

অধ্যাপক বর্মার ভাষায়, ''...বিকল্প চিকিৎসাপদ্ধতিগুলির টিঁকে থাকার প্রথম ও প্রধান কারণ হল (আধুনিক) চিকিৎসার সীমাবদ্ধতা। তা সমস্ত রোগ সারাতে তো পারেই না, এমনকি রোগের সব পীড়াদায়ক লক্ষণগুলিকেও নিরাপদভাবে দূর করতে পারে না। এর ওপর এই পরিষেবা সহজে পাওয়া যায় না, আর এর খরচ সবার আয়ত্বের মধ্যে নয়।''

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের এই খামতি আর প্রয়োগের সীমাবদ্ধতা অন্য সব ধরনের চিকিৎসার 'রোগ-আরোগ্য'-কে মানুষের কাছে ক্রয়যোগ্য করে তোলে। যে রোগী বহুদিন ধরে ভুগছেন, বা যাঁকে আধুনিক চিকিৎসা সারাতে পারছে না, তাঁর যদি মনে হয় যে কোনো 'প্যাথি' একটুও কাজে লাগবে তো তার শরণ নেওয়াই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। আর রোগীর এই যেন-তেন প্রকারে সুস্থ হবার মর্মন্তুদ ইচ্ছের সঙ্গে পাল্লা রেখে কিছু 'চিকিৎসক'-এর অপ্রমাণিত অকার্যকর 'চিকিৎসা' বেচে দু'পয়সা কামিয়ে নেবার লোভও বেড়ে যায়।

আর এখানেই টাকা-কড়ির বিষয়টা নিয়ে আমাদের ভাবতে হয়, ভাবতে হয় বর্তমান চিকিৎসার জগতে টাকার অনৈতিক ভূমিকার কথা। মানুষের দৈনন্দিন ব্যয়ের একটা বড় অংশ স্বাস্থ্যখাতে খরচা হচ্ছে, আর স্বাস্থ্য-ব্যবসায়ীদের হাতে, বিশেষ করে ওষুধ কোম্পানিগুলোর হাতে

অঢেল সম্পদ জমা হচ্ছে। আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থাই বলুন আর 'বিকল্প' ব্যবস্থা, বিপুল অর্থের প্রবল চাকচিক্যে চিকিৎসা পেশায় আসা বহু মানুষ নীতিহীন হয়ে পড়ছেন। অবস্থাটা এতদূর খারাপ হয়ে উঠেছে যে গবেষক, নীতি-নির্ধারক ও চিকিৎসক— এঁদের অনেকেই নিজের ক্ষেত্রে বাজারের তথা অর্থের খাতিরে আধুনিক চিকিৎসার 'বিজ্ঞান' অংশটির সর্বনাশ করতে পিছপা হচ্ছেন না।

অধ্যাপক বর্মা জানাচ্ছেন, চিকিৎসার সঙ্গে অন্যান্য বিজ্ঞানের আর একটি ফারাক হল এই যে একজন চিকিৎসকের মতো পদার্থবিজ্ঞানী বা রসায়নবিদকে মানুষের মাঝখানে বসে তাঁদের সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করতে হয় না। জীবন্ত সামাজিক মানুষের রোগ সারানোর বা অন্তত তাঁকে আরাম দেবার উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রয়াসের সাফল্যের ওপর দাঁড়িয়েই চিকিৎসার চূড়ান্ত মূল্যায়ন হয়, ফলে চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রয়োগে তাৎক্ষণিক ফলাফল লাভের প্রবল চাপ থাকে। অন্য বিজ্ঞানের সাফল্যের চাহিদাটা সেরকম ঘনিষ্ঠ ও তাৎক্ষণিক নয়।

জ্ঞানের প্রয়োগে তাৎক্ষণিক ফলাফল বিচার— এ ব্যাপারটা চিকিৎসকদের পেশা সম্পর্কে কৌতূহলোদ্দীপক অর্ন্তদৃষ্টির জন্ম দেয়। প্রভূত

চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রয়োগে তাৎক্ষণিক ফলাফল লাভের প্রবল চাপ থাকে। অন্য বিজ্ঞানের সাফল্যের চাহিদাটা সেরকম ঘনিষ্ঠ ও তাৎক্ষণিক নয়।

বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও পদ্ধতিতন্ত্র আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যার অবিচ্ছেদ্য অংশ, অথচ তাকে 'বিজ্ঞান' বলে অভিহিত করা অর্ধসত্য। যে আধুনিক চিকিৎসাবিদ্য প্রয়োগ করা হয় তার আখ্যানকে বুঝতে হবে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সঙ্গে কলা বিজ্ঞানের সঙ্গম হিসেবে, যাতে ভাবের আদান-প্রদান ক্ষমতা, মনোবিদ্যা, সমাজবিদ্যা, এমনকি রাজনৈতিক জ্ঞান চিকিৎসা-পেশার অংশ হয়ে ওঠে।

অধ্যাপক বর্মা তাঁর বইয়ের পাঠককে মসৃণভাবে যেন একটা টাইম-মেশিনে চাপিয়ে প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত চিকিৎসাবিদ্যার দীর্ঘ ইতিহাসের মধ্য দিয়ে পথ-পরিক্রমণ করিয়ে আনেন। এ পথে তিনি বিভিন্ন সময়ের সামাজিক প্রেক্ষিতে, জ্ঞানবিজ্ঞানের সমসাময়িক অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে, চিকিৎসার বিকাশকে খতিয়ে দেখেন।

অধ্যাপক বর্মা তাঁর ইতিহাস-পাঠ থেকে যেসব সিদ্ধান্তে আসেন তাদের অনেকগুলো নজর কাড়ার মতোঃ

অধ্যাপক বর্মার ধারণায়, আদিম জাদুবিদ্যা বা ডাইনি-বিদ্যা সমস্ত প্যাথি-র চিকিৎসার পূর্বসূরী। আধুনিক চিকিৎসা হল আদিম এই বিদ্যার সবচেয়ে যুক্তিবাদী পরিণতি। জাদুবিদ্যা বা ডাইনি-বিদ্যা যদিও রোগের জন্য দুষ্ট-আত্মা আর অতিপ্রাকৃতিক কারণকে দায়ী করত, তবু তা ছিল বিজ্ঞানের বীজ, কেননা রোগের কিছু একটা কারণ আছে সেকথা এ বিদ্যা ভাবতে পেরেছিল। এই অর্ন্তদৃষ্টি সে সময়ের সাপেক্ষে বৈপ্লবিক, আর এই অর্ন্তদৃষ্টির ওপর ভর করেই নানা নিরীক্ষণ, তত্ত্বপ্রস্তাব ও পরীক্ষার ভিত্তিতে চিকিৎসার সমস্ত সিস্টেম পরে গড়ে ওঠে। ৭০০ থেকে ৪০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে তিনটি দেশ— চিন, ভারত আর গ্রিসে, অতীন্দ্রিয়বাদী থেকে বস্তুবাদী চিকিৎসাবিদ্যায় উত্তরণ ঘটে। ভারতীয়রা যে নতুন তত্ত্ব আনেন তা দুষ্ট-আত্মার জায়গায় তিনটি রস— বায়ু, পিত্ত, কফ, এদের সাম্যের অভাবকে অসুখের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করল। বায়ু, পিত্ত, কফ মোটের ওপর শ্বাসতন্ত্র, রক্তসংবহনতন্ত্র ও পরিপাকতন্ত্রের সূচক। চিনারা ইয়ান এবং ইং এই দুয়ের দ্বান্দ্বিক ক্রিয়ার ধারণা দিলেন। গ্রিসে হিপোক্রেটাস চারটি রসের তত্ত্ব আনলেন। অধ্যাপক বর্মা বলছেন, ''রোগের বাস্তব কারণ আছে— এই তত্ত্ব একদিকে বাস্তব উপাদানের সাহায্যে রোগ সারানোর প্রচেষ্টার জনক হল, অন্যদিকে মানব শরীরবিদ্যা নিয়ে পরীক্ষা ও আবিষ্কারের পথ দেখাল।''

অধ্যাপক ভার্মার মতেঃ ''আধুনিক চিকিৎসা আয়ুর্বেদের ওপর ধারণাগত (conceptual) কোনো উন্নতি নয়; তা (আধুনিক চিকিৎসা) চিকিৎসার সমস্ত সিস্টেমকে আত্মস্থ করেছে, তাদের সঙ্গে ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে, এবং তাদের সবার চাইতে এগিয়ে গিয়ে যতদূর সম্ভব যুক্তিবাদী অবস্থানে পৌঁছেছে।'' বর্মা বলছেন আধুনিক চিকিৎসার সার কথা হল এই ঃ যা কিছু কার্যকর বলে প্রমাণ করা যায় না তাকে পরিত্যাগ করা, তা যে কারণেই সেটা অতীতে ব্যবহৃত হয়ে থাকুক না কেন; আর এখানেই ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় বা চৈনিক চিকিৎসার সঙ্গে আধুনিক চিকিৎসার তফাৎ। ঐতিহ্যবাহী সিস্টেমগুলি ঐতিহাসিকভাবে চিকিৎসার ধারাকে সমৃদ্ধ করেছে, কিন্তু নতুন জ্ঞানের সাথে খাপ খাইয়ে

যেকোনো সিস্টেমের চিকিৎসকের কাছে আসা রোগীদের একটা বড় অংশ সেরে যায় ও চিকিৎসকের ওপর সন্তুষ্ট থাকে।

নিজেকে পরিবর্তিত করতে পারেনি, ফলত রোগ ও চিকিৎসা সম্পর্কে বাতিল হয়ে যাওয়া পুরনো ধ্যান-ধারণার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রেখেছে।

বিকল্প চিকিৎসাব্যবস্থাগুলি টিঁকে থাকার কারণ হিসেবে অধ্যাপক বর্মা বলছেন, মানবশরীরের নিজেকে সারিয়ে তোলার অনবদ্য ব্যবস্থা আছে। সুতরাং যেকোনো সিস্টেমের চিকিৎসকের কাছে আসা রোগীদের একটা বড় অংশ সেরে যায় ও চিকিৎসকের ওপর সন্তুষ্ট থাকে। আর সেজন্যই উন্নয়নশীল দেশগুলিতে কোনো সিস্টেমেই প্রশিক্ষণ নেননি যাঁরা এমনকি তাঁরাও দিব্যি 'চিকিৎসা' করেন আর নিয়মিতভাবে রোগী পান। এছাড়াও সমস্ত ওষুধেরই একটা 'প্লাসিবো' ক্রিয়া (বাংলায় 'রোগীতোষ ক্রিয়া') থাকে এবং অনেক রোগী স্রেফ তাতেই সেরে যান।

চিকিৎসার বিভিন্ন সিস্টেম বহু শতাব্দী ধরে কী পথে এগিয়েছে আর তাদের ভালো-মন্দ দিকগুলোই বা কী তা নিয়ে ''দ্য আর্ট অ্যান্ড সায়েন্স অফ হীলিং সিন্স অ্যান্টিকুইটি'' বইতে এরকম অনেক জ্ঞানের মণিমুক্তো ছড়ানো আছে। একজন পাঠক চিকিৎসার বিভিন্ন সিস্টেমকে যেভাবেই মূল্যায়ন করুক না কেন যুক্তিবাদী পদ্ধতিতে বা তাঁর নিজস্ব পছন্দমাফিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে, এই বই তাঁকে তাঁর মতো করে ভাবার যথেষ্ট মালমসলা যোগায়।

অধ্যাপক বর্মা চিকিৎসার কোনো বিশেষ সিস্টেমের পক্ষে বা বিপক্ষে সম্পূর্ণ সাধারণীকরণ করে সিদ্ধান্ত টানেন নি, কিন্তু দৃশ্যমান বা সহজপ্রাপ্য সাক্ষ্য-প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে কয়েকটি নির্দিষ্ট অসুখের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সিস্টেমের কার্যকারিতা সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য রেখেছেন। অত্যন্ত আবেগবর্জিত ভঙ্গি বজায় রেখে তিনি আধুনিক বনাম ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা বিতর্কে যে তিক্ততা আমরা সর্বদা দেখে থাকি সেই তিক্ততা এড়িয়ে গেছেন। এটা করা কম বড় অবদান নয়,

কারণ সাধারণ মানুষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা হল যেন চিকিৎসকেরা তাত্ত্বিক চশমাকে সরিয়ে রেখে মানুষের ভালো কিসে হয় সেটার দিকে পুরো মনযোগ দেন। ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসাপ্রণালীতে যদি কিছু কার্যকর চিকিৎসা থেকে থাকে তবে সেটা যেন আধুনিক চিকিৎসা সংস্কারমুক্ত মনে গ্রহণ করে, আর আধুনিক চিকিৎসার কিছু যদি স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হয় তবে তা যেন বর্জন করা হয়। অন্যদিকে, ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসার যা কিছু শুধু অকার্যকর নয়, ক্ষতিকারকও বলে প্রমাণিত, তা যেন অবিলম্বে বন্ধ করা হয়।

অধ্যাপক বর্মা অজস্র সূত্র থেকে তাঁর পাঠ নিয়েছেন ও তার সার সংগ্রহ করে এই বইয়ের পাতায় তুলে ধরেছেন; তাই এমনকি যে পাঠক তাঁর সমস্ত মন্তব্য ও ইতিহাস পাঠের সঙ্গে একমত হবেন না তাঁদের কাছেও এই বইটি এক সম্পদ। এই বইতে চিকিৎসাবিদ্যা ও তার ইতিহাস সম্পর্কে যে বৃহৎ তথ্যসূত্রের তালিকা আছে কেবলমাত্র তারই যা মূল্য তার জন্যই এই বই সাথে রাখা

বিকল্প চিকিৎসাপদ্ধতিগুলির টিঁকে থাকার প্রথম প্রথম ও প্রধান কারণ হল (আধুনিক) চিকিৎসার সীমাবদ্ধতা।

দরকার। ডাক্তারি পেশা আজকের পৃথিবীতে সবথেকে ক্ষমতাশালী পেশাগুলোর মধ্যে একটি। অধ্যাপক বর্মার পরিচ্ছন্ন ও বুদ্ধিদীপ্ত বইটি চিকিৎসা ও চিকিৎসকদের পেশা নিয়ে আমাদের ধারণাকে স্বচ্ছ করার এক মূল্যবান উপাদান।

আপনি রাজনীতিবিদ হন বা ব্যবসায়ী, ক্ষমতাবান হন বা সাধারণ মানুষ, জীবনের কোনো একদিন আপনাকে সমস্ত সামাজিক আবরণ সমস্ত পোশাক খুলে মুখ বুজে অপারেশন টেবিলে শুয়ে পড়তে হবে, চিকিৎসক আপনাকে তাঁর ছুরি দিয়ে নিজের বিচার মতো কাটাকুটি করবেন; আর তাঁর ছুরির তলায় যাবার সুযোগ দিয়েছেন বলে বেশ মোটা টাকা নিয়ে নেবেন। প্রত্যেকে জীবনের কোনো না কোনো দিন চিকিৎসকের হাতে আত্মসমর্পণ করেন, আর সেকারণে চিকিৎসকের পেশা পৃথিবীতে ভগবানের প্রতিনিধির উচ্চতা লাভ করে। চিকিৎসক যেন আপনার প্রাণ দেবার ক্ষমতা রাখেন, আবার প্রাণ নেবার ক্ষমতাও।

চিকিৎসার জগতে রহস্যময় পর্দার আড়াল থেকে আমাদের সামনে এনে হাজির করেছেন অধ্যাপক বর্মা। এটি চিকিৎসা পেশায় অনভিজ্ঞ কোটি কোটি সাধরণ মানুষের ক্ষমতায়ন প্রকল্প। তাঁরা এতোদিন ভগবান আর তাঁর প্রতিনিধি চিকিৎসকের হাতে তার নিজের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা দিয়ে রেখেছিলেন; এই বই সে ক্ষমতা তাঁদের নিজের হাতে ফিরিয়ে নেবার প্রচেষ্টার এক পদক্ষেপ।

লেখক পরিচিতি ঃ সত্য শিবরামন শান্তিনিকেতনের বাসিন্দা, সাংবাদিক ও জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের এক কর্মি।
তাঁকে যোগাযোগ করার ই-মেলঃ sagarnama@gmail.com

অনুবাদক পরিচিতিঃ অনুবাদক ডা. জয়ন্ত দাস, ত্বকরোগ বিশেষজ্ঞ ও প্রাবন্ধিক।

পাভলভ ইনস্টিটিউটের দু'টি পত্রিকা

মানবমন
মনোবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞানের আধুনিক ধারা পরিচায়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা
বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ১০০ টাকা

Psyche and Society
Six-monthly Journal
Yearly Subscription Rs. 50

advt.

পাভলভ ইনস্টিটিউট
৯৮, মহাত্মা গান্ধি রোড
কলি - ৭০০০০৭
ফোন- ২২৪১ ২৯৩৫
৯৪৭৭২৪২৯৩৯
৯৪৩৩৬৬২৭৭৬

পাভলভ ইনস্টিটিউটের ক'টি বই

ডা. ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়-এর
পাভলভ পরিচিতি (দেড়শো টাকা)
শৈশব ও তার সমস্যা (পঞ্চাশ টাকা)
বিচ্ছিন্নতার ভবিষ্যৎ (দুশো টাকা)

ডা. বাসুদেব মুখোপাধ্যায়-এর
গ্রামীণ স্বাস্থ্য (চল্লিশ টাকা)
রোগ অসুখ (আশি টাকা)

চিঠিপত্র

ভগবান নিদ্রা গিয়েছেন

বঙ্গদেশে (পুব এবং পশ্চিম মিলিয়ে) একটা সংস্কার দীর্ঘদিন ধরে দানা বেঁধে আছে। তা হল ''ডাক্তারেরা ভগবান।''

ধারণাটা আরো প্রাঞ্জল করলে দাঁড়ায়— ডাক্তারেরা দীন-দুঃখীর সেবা করবেন নিঃস্বার্থভাবে। নিজেদের আরাম বিলাসের কথা চিন্তা করবেন না। রাত্রে নিদ্রা যাবেন না। আরো ভালো হয় যদি তাঁরা নিজেদের ঘর সংসার ত্যাগ করেন এবং মুনি ঋষিদের মত সারাক্ষণ রোগ আর রুগীর ধ্যান করে যান।

তা এরকম ভগবান ডাক্তার যে এক-আধটা কখনো হয়নি, তা হলফ করে বলতে পারবো না। তবে বেশীর ভাগটাই আশামিশ্রিত কল্পনা। এই কল্পনাটা আরো মজবুত হয়েছে বাংলা সিনেমা আর গল্পের মাধ্যমে। তা গল্পের গরু তো গাছেও চড়ে। তাতে আর ক্ষতি কি?

অপরিসীম ক্ষতি। লোকেদের মনে ডাক্তারের এইরকম ভাবমূর্তি একেবারেই বাস্তবের সাথে খাপ খায় না।

ডাক্তারবাবুদের খেলার মাঠে দেখা যায়, ঘরে বসে তাঁরা টিভি সিরিয়ালও দেখেন। সিনেমা দেখতে ছোটেন। কিছুজন আবার বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে কখনো সখনো মদ্যপানও করেন, কেউ কেউ আবার মিটিংমিছিল করে বেড়ান। ''ভগবানের'' পা দুটো তো মাটির— সে কি! এ তো আমাদের কল্পনাপ্রসূত ডাক্তার নয়। মার শালাকে!

কি অদ্ভুত চিন্তাপ্রবাহ। চারিদিকে এই সামাজিক বৈষম্য আর অবক্ষয়ের যুগে যেখানে অর্ধেক করনিক দেরীতে অফিসে আসেন, অর্ধেক বড়কর্তা ঘুষ ছাড়া কাজ করেন না, অর্ধেক রাজনীতিক খুন-দাঙ্গার মামলায় জড়িত, অর্ধেক স্কুল শিক্ষক নিষ্ঠার সঙ্গে প্রাইভেট টিউশনি করে বেড়ান— ব্যবসায়ী প্রোমোটারদের কথা বাদই দিলাম— সেখানে আমরা আশা করতে থাকবো ডাক্তারেরা ভগবান হয়ে যাবে?

অত: কিম।

সমাজ একজন ডাক্তারের কাছে কি চাইতে পারে? তা হল পেশাগত নিষ্ঠা— একটা পেশাদারী (Professional অর্থে) মনোভাব। একজন ডাক্তার যেন চুরি ডাকাতি না করেন, ওষুধ কোম্পানির দালালী না করেন, ল্যাবরেটরীগুলোর কমিশন না খান আর নিষ্ঠার সাথে পেশায় মনোনিবেশ করেন।

তা চুরি ডাকাতি না করা, কমিশন না খাওয়া নিষ্ঠাবান ডাক্তারের সংখ্যা কিন্তু প্রচুর— ''স্বাস্থ্যের বৃত্তে''র বাইরেও। তাতে আপামর জনসাধারণের কি লাভ হয়েছে? এই প্রসঙ্গে পরে আসছি। আপাতত আমি শ্রী অংশুমান ভৌমিকের ধারাবাহিক প্রচেষ্টায়— ''স্বাস্থ্যে বৃত্তে''র মাধ্যমে আদর্শ ডাক্তারের ছবি তুলে আনা— সেই ''সপ্তপদী'' থেকে। মধ্যবিত্ত বাঙালীর মনের মতো খোরাক— ডাক্তার নয় ভগবান চাই। এই ছবির সাথে উনি ডা. দ্বারকানাথ কোটনিশ, ডা. বিনায়ক সেনদেরও এনে ফেলেছেন। বাঙালীর এ দীর্ঘকালের স্বভাব। একটু ব্যতিক্রমী গুণী মানুষকে সুযোগ পেলেই ভগবান বানিয়ে ফেলা। তা রবীন্দ্রনাথই হোন বা রামমোহন। অবশ্য তা করা হয় মানুষটি মারা গেলে। কিন্তু ভৌমিকবাবুর বিনায়ক সেনকে জীবিত অবস্থাতেই ঐ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা একটা কেলেঙ্কারী।

ডা. বিনায়ক সেনের সাথে আমি ছত্তিশগড় এলাকায় টানা ছ'বছর কাজ করেছি, তাই ঘনিষ্ঠভাবে চিনি। একেবারে সাধারণ মানুষ উনি। আমরা প্রায় দিনই কাজকর্ম সেরে গল্প করতে বসতাম। আরো অনেকে থাকতেন, রাত দুটো তিনটে পর্যন্ত। স্রেফ আড্ডা। সবাই মিলে ফিষ্টি করেছি অনেক দিনই। নিয়োগীজি ভারী সুন্দর বেসন দিয়ে পুঁইশাক ভাজতেন আর নিখুঁতভাবে স্যালাড বানাতেন। (হ্যাঁ, শঙ্কর গুহনিয়োগী— উনিও একেবারে সাধারণ মানুষ ছিলেন)। বিনায়কদার দুধ দিয়ে মাংস রান্না— এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা— প্রায় পুরোটাই ফেলে দিতে হয়েছিল। আমরা মাঝে মাঝে বেড়াতে যেতাম বস্তারের জঙ্গলে— কোন এক আদিবাসী গ্রামে গিয়ে মাঝরাতে মুরগীর মাংস আর ভাত।

বিনায়কদার সবচেয়ে বড় গুণ উনি একজন নিষ্ঠাবান ডাক্তার। তাই তিনি বুঝেছেন— শুধু নিষ্ঠার সাথে ডাক্তারী করলেই গরীব মানুষের খুব কিছু উপকার হয় না। আমাদের দেশের আর্থসামাজিক পরিবর্তন না হলে, রোগ বা রুগীর প্রায় কিছুই করা যাবে না, তাই রাজনৈতিক আন্দোলন। সাবধান বিনায়কদা, ''স্বাস্থ্যের বৃত্তে'' আপনাকে ফটো ফ্রেমে পূজোর চেষ্টায় নেমেছে, লু শুনের ''আ কিউ'' বানিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা।

এবারে আসি ''ভগবান'' ডাক্তার আর ''নিষ্ঠাবান'' ডাক্তারের বিতর্কের (আমারই তোলা) প্রসঙ্গে। এই বিতর্কের শুধু যে মানে নেই তা নয়— ডাক্তারের ভাবমূর্তি নিয়ে আলোচনা আসল সমস্যাকে এড়িয়ে চলা।

আজকের আর্থসামাজিক পরিবেশে একজন নিষ্ঠাবান ডাক্তার কি করতে পারে? প্রায় কিছুই না। শিশু অপুষ্টিতে ভুগবে আর ডাক্তার তাকে ওষুধ গেলাবে! গ্রামের মানুষ উচ্ছেদ হয়ে শহরের বস্তিতে, রেললাইনের ধারে, ফুটপাথে মাথা গুঁজবে— আর অসুখ হলে ডাক্তার তার চিকিৎসা করে যাবে? ন্যূনতম পুষ্টির, শিক্ষার, স্বাস্থ্যের অধিকার যেখানে নেই— সেখানে ডাক্তার এবং তার ভাবাদর্শ?

আমি মনে করি মানুষের সুখ স্বাচ্ছন্দ স্বাস্থ্য শিক্ষার প্রতি সমাজের কিছু দায়বদ্ধতা থাকে। এটা আশা করা যায় সরকার তার নাগরিকদের বাসস্থান শিক্ষা পুষ্টি ইত্যাদির দায়িত্ব নেবে। তা না হয়ে আমাদের দেশে শুধুই লাভ লোকসানের হিসেব। স্বাস্থ্য, পরিবহন ইত্যাদিতে সরকারের নাকি দেদার লোকসান। ডিজেলে ভর্তুকি তুলে দিতে সরকার বদ্ধপরিকর। এখন হচ্ছে সরকারী বেসরকারী যুগ্ম প্রচেষ্টা। মানে সরকার হাত ধুয়ে ফেলবে। উপরন্তু সর্বসাধারণের ব্যবহৃত জমি, জঙ্গল, জল, বাতাস দেশী বিদেশী ব্যবসায়ীদের হাতে বেচে দেবে। তোমার পয়সা থাকে তুমি খাও, দাও, ঘুরে বেড়াও, না থাকে তো বুঝে করো। সরকারের কোন দায় দায়িত্ব নেই।

এহেন পরিস্থিতিতে ডাক্তারদের ভগবান সদৃশ মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ করে ''স্বাস্থ্যের বৃত্তে'' কি বৃত্তে ঘুরতে চাইছে বোধগম্য হচ্ছে না।

ডা. আশীষ কুমার কুন্ডু
করুণাময়ী হাউজিং এস্টেট
কলকাতা -৭০০০৯১

সম্পাদক,
স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্যের বৃত্তে তৃতীয় সংখ্যায় 'অশোক বন্দোপাধ্যায় স্মরণে' শ্রীপবন মুখোপাধ্যায়ের লেখাটি পড়ে একটা অস্বস্তিবোধ হচ্ছিল— চতুর্থ সংখ্যায় এই প্রসঙ্গে সম্পাদকের বক্তব্যে অস্বস্তিটা বাড়ল বই কমল না! পত্রিকার পাঠকরা সবেমাত্র এটুকু ভরসা করার কথা চিন্তা করতে শুরু করেছে যে বিজ্ঞান-সমাজ-চিকিৎসা সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা সম্যক জ্ঞানের প্রসারই পত্রিকাটির মুখ্য উদ্দেশ্য। এই সময়ে যদি পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত মানুষেরা ব্যক্তিগত কাটাছেঁড়া সাদাকালোয় প্রকাশ করে ফেলে তাহলে যাত্রাশুরুতেই উদ্দেশ্যটি বানচাল হয়ে যাবার সমূহ সম্ভাবনা!

উৎস মানুষের অনিয়মিত পাঠক ছিলাম। অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ব্যক্তিগত কোনো পরিচয় ছিল না কখনো। জানিনা অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়-পবন মুখোপাধ্যায়ের সম্পর্কের ব্যাকরণ! কিন্তু তাতেও লেখাটির শেষাংশ পড়ে মনে হচ্ছে যেন অশোকবাবু সম্পর্কে দীর্ঘদিন ধরে মনে চেপে রাখা ওই কটি নেতিবাচক বাক্য প্রকাশের জন্যই লেখাটির অবতারণা। অন্য কোনো মঞ্চে এই প্রসঙ্গে তিনি লিখতেই পারেন, কিন্তু একটি পূর্ণ বিজ্ঞানের পত্রিকায় কোনো বিশ্লেষণই (ব্যক্তিনিন্দা বলতে রুচিতে বাধে) ব্যক্তিকেন্দ্রিক হওয়া উচিৎ নয়। লেখককেও সবকিছু নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে— ভাবাদর্শ, তত্ত্ব বা তথ্যগত যে কোনো সমালোচনা সবসময়ই ভালো। কিন্তু ব্যক্তিস্তুতি যেমন বিজ্ঞানের ধর্ম নয়— ব্যক্তিনিন্দাও তেমনই পরিত্যাজ্য। পবনবাবু দুই দশক ধরে অশোকবাবুকে চিনতেন বলে তাঁর লেখায় 'ব্যক্তিগত বোঝাপড়া থাকাটাই স্বাভাবিক'— সম্পাদকের এই মন্তব্য দুঃখজনক। ব্যক্তিগত বোঝাপড়ার আড়ালে পাঠকের মনে পত্রিকাটির একটি আস্তিন গোটানো ছবি উঁকি দেওয়ার আশঙ্কা আছে।

শনিবারের চিঠি-র সজনীকান্তের চাবুক **স্বাস্থ্যের বৃত্তে**-র সম্পাদকের হাতে মানায় না। তাই তাঁকে কোনো ব্যক্তি সংক্রান্ত কূটকাচালিকে প্রশ্রয়সূচক শব্দ নির্বাচনের আগে একবার নয়— সহস্রবার ভাবতে হবে। যে পরিচিত ২০ জনকে এখনও পর্যন্ত **স্বাস্থ্যের বৃত্তে**-র গ্রাহক করেছি, কমবেশি সবাই বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ জানিয়েছেন। সে-জন্যই পত্রিকার শুভাকাঙ্ক্ষী হিসাবে চিঠিটি লিখলাম।

শুভেচ্ছাসহ
ডা.শর্মিষ্ঠা দাস, দুর্গাপুর

প্রতি
সম্পাদক,

কথাটা শুনলে হয়তো চুড়ান্ত অসংবেদনশীল শোনাবে, কিন্তু একথা না বলেও পারছি না, অসুখ সংক্রান্ত এমন সুখপাঠ্য পত্রিকা আমি এর আগে পড়িনি। একবার হাতে নিলে আগাপাশতলা শেষ না করে ওঠা যায় না। এখানে যেমন আছে সহজ করে বলা কঠিন রোগের আলোচনা, তেমনই আছে তথাকথিত সহজ রোগের চিকিৎসার খুঁটিনাটি। আর সবই যেন গল্পচ্ছলে। এই ব্যাপারটাই আমাদের মতো সামান্য পাঠককে ধরে রাখে। এখানে আমরা পেয়ে যাই মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ার প্রাথমিক ব্যবস্থাপ্রণালী, তেমনই এখানে আছে কাদম্বিনী দেবীর সংগ্রামের কথা। আবার উত্তমকুমার অভিনীত সপ্তপদী চলচ্চিত্রে নতুন আলোকপাত, সেও আছে! ফটোগ্রাফ ও হাতে আঁকা ছবিগুলিও ঝকঝকে ও সহজেই প্রণিধানযোগ্য। মুদ্রণ ভুলও চোখে পড়ে না।

শুধু দু'একটা কথাই বলবার। এবছর ফেব্রুয়ারি মাসে মা'কে (বয়স ৭২) নিয়ে আমরা লে-লাদাখ ঘুরে এসেছি। সবাই বারণ করা সত্ত্বেও এই হঠকারিতা আমরা করেছিলাম মায়ের শরীর-স্বাস্থ্য দেখে। এই বয়সেই মা বাজার-হাট-ব্যাঙ্ক- পোস্ট-অফিস সবই করেন। বাড়িতেও মাকে খুঁজে পাওয়া যায় না, কোথায় কোন ঝড়ের পরে উলটপালট হয়ে যাওয়া মালতীলতার ঝাড় সোজা করে বাঁধছেন, দেবদারু গাছের ডাল ছাঁটছেন, আর এসবই ভাঙা পা নিয়ে (বছর পাঁচেক আগে সরে যাওয়া প্যাটেলা তার দিয়ে বাঁধা থাকা সত্ত্বেও)। লে-লাদাখে গিয়ে মায়ের পেটে সংক্রমণ হয়, যাকে প্রাথমিকভাবে আমরা অ্যাক্লিমেটাইজেশনের সমস্যা বলে ভেবেছিলাম। পরে ঠিকঠাক ওষুধ পেয়ে মা'র শরীর ঠিক হয়ে যায়। কিন্তু অন্য যাদের সত্যিসত্যিই এই অ্যাক্লিমেটাইজেশনের সমস্যা হয়, তাঁদের ও তাঁদের ভ্রমণবন্ধু ও পরিবার পরিজনের জন্য একটি লেখার অনুরোধ জানাচ্ছি।

আর একটা কথা অনেকেই ডাক্তার না দেখিয়ে 'পাকামো' করে নিজেদের অসুখ নিজেরাই নির্ণয় করেন এবং নিজেদের ইচ্ছামতো ওষুধ খান। সাধারণ জ্বর-জ্বালা, হাঁচিকাশি, ছড়ে যাওয়ায় না হয় ডাক্তার দেখানো দরকার নেই, কিন্তু অন্যান্য জটিল সমস্যায় এই 'নিজের ডাক্তারি নিজে করুন' ব্যাপারটিতে অসুখ জটিলতর হয়ে উঠতে পারে। এই নিয়েও একটা লেখা আশা করি।

প্রিয় পত্রিকার কাছে আবদারের শেষ নেই। সবে চারটি সংখ্যা বয়েস যার, সে ভবিষ্যতে আরও বড় হয়ে উঠবে, তার লেখালেখির সংখ্যা ও বৈচিত্র্য আরও বাড়বে, এই তো আশা করি। ফের একটি আর্জি জানাই। আজকালকার ডাক্তাররা নিজেদের ক্লিনিকাল অ্যাকুমেনের উপর আস্থা না রেখে প্রথমেই একগাদা পরীক্ষা-নিরীক্ষার নির্দেশ দেন, যার অনেকাংশেই জরুরি নয়। অসহায় অসুস্থ মানুষটি এবং তার পরিবার পরিজনের উপর এতে অনর্থক চাপ বাড়ে। এর ব্যবস্থা আবার সরকারি হাসপাতাল ও প্রাইভেট নার্সিংহোমে নানারকম। আবার একথাও ঠিক, যে যে ডাক্তার যত বেশি ওষুধ দ্যান ও বেশি বেশি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরামর্শ দ্যান, সাধারণ রোগী তাঁকেই বড় ডাক্তার মনে করেন। হা হতোস্মি।

আরও একটা প্রশ্ন। সাধারণত দেখা যায় কলেজপড়ুয়া মেডিকেল সায়েন্স ছাত্রী পাশ করে স্ত্রীরোগ ও ধাত্রীবিদ্যার ডাক্তার হন। মেডিসিন ও শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ তাও দেখা যায়, কিন্তু মহিলা সার্জেন প্রায় দেখাই যায় না। এর কারণ কী? রোগিনী স্ত্রীরোগ ও ধাত্রীবিদ্যার মহিলা ডাক্তারের কাছেই যাবেন সে বিষয়ে একটা কারণ আন্দাজ করা যায়, কিন্তু মহিলা শল্যচিকিৎসকের পসার হয় না কেন? ভরসা করা যায় না বলে? কিন্তু তাই বা কেন? আমাদের পিতৃতান্ত্রিক সমাজেরই একটি জটিল ছবি কি এটি? মেয়েদের শুধু মেয়ের ক্ষেত্রেই বেঁধে রাখা, তাকে তার বাইরের মূল স্রোত থেকে ব্রাত্য করে রাখা? দশভুজার হাতে দশটি অস্ত্র তুলে পূজো করে বাড়ি ফিরে স্ত্রীর প্রতি অন্যায় অবিচার অবহেলা?

আমার বিশ্বাস, এই ধরনের সব লেখাপত্তর নিয়ে আমরা এই পত্রিকার বিষয়সম্ভার থেকে ঋদ্ধ হব। যা আশ্বাসের জায়গা, সেখানেই মানুষ আশা নিয়ে দাঁড়ায়। আমার আশার পরিমাপ দেখে আমায় ক্ষমা করে দেবেন, এই আমার আস্থা, কিন্তু এই বিষয়গুলি সত্যিই আমার ও আমাদের বিশদে ও সহজ ভাষায় (যা এই পত্রিকার প্রধান গুণ) জানা প্রয়োজন। এরকম একটা অসাধারণ প্রয়াসের জন্য এই পত্রিকার অনেক ভালোবাসা, শুভেচ্ছা, ধন্যবাদ প্রাপ্য।

ইতি
মন্দাক্রান্তা সেন।